ঝাড়ফুঁক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

শৈলেন সাধুখাঁ বেধড়ক ঝেড়ে দিলে। আমার যেমন বরাত। সারাটা জীবন াড়ই খেয়ে গেলুম। কটা বাঁশঝাড় যে খালি হল! একটা পেপার-মিল যত বাঁশ ায়, আমি বোধহয় তার ডবল বাঁশ খেয়ে বসে আছি। বয়েস আমার কতই বা বে! হাফ সেঞ্চুরি। সংসার যদি ক্রিকেট মাঠ হত আর আমি যদি 'সানি' াওস্কব হতুম তাহলে সবাই তালি বাজাতো। আর আমি তখন প্যাভেলিয়ানের কে তাকিয়ে ব্যাট উঁচিয়ে উঁচিয়ে, মুখে মোনালিসার হাসি টেনে আবার চক্কা, ক্কা মারার কেরামতি শুরু করতুম। সংসার বড় 'থ্যাংকলেস' জায়গা। সবাই াডন আর নানা ডায়ামিটারের ছোলা, আছোলা বাঁশ নিয়ে ঘুরছে। এ ওকে ঝাড়ছে, ও একে ঝাড়ছে। এ ওকে বাঁশ দিচ্ছে, ও একে। বাঙালীদের মধ্যে এই াঁশাবাঁশিটা খুব বেড়েছে। আমি যদি পেপার মিল হতুম তাহলে এই এত বাঁশ াবাব পর টন টন ভালো মিহি কাগজ বের করতে পারতুম।

এই শৈলেন সাধুখাঁ লোকটি ভারী মজার। কৃষ্ণবর্ণ। আগে রোগা পাতলাই হলেন। ইদানীং মাতৃবিয়োগের পর বেশ মুটিয়েছেন। ক্লোজ ক্রপড কাঁচাপাকা ল। ধুতি আর ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরেন। আর সারাদিন পুকপুক গারেট খান। সব বিষয়েই ভীষণ জ্ঞান। আর সারাদিন 'বলো হরি-র' খইয়ের তো সেই জ্ঞান এধারে ওধারে ছড়ান। যে বিষয়ে যে কথাই বলেন, সেইটাই শষ কথা। ওরপর আর কিছুই বলার থাকে না। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে, সিগারেট রা হাতটা পাশে ঝুলিয়ে যখন বলেন, 'কেউ কিস্যু জানে না। আরে মশাই সব বাগাস, সব বোগাস।' তখন ভীষণ ভয় করে। সত্যিই তো পৃথিবীর তাহলে কি বে? উনি তো এক গণ্ডূষে পৃথিবীর জ্ঞানসমুদ্র শুষে নিয়েছেন, অন্য মানুষ জ্ঞান ার পাবে কি করে!

শৈলেনবাবু যখন ঝাড়েন তখন তাঁকে বেশ দেখায়। মুখটা ভার ভার হয়। নচের পুরু ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে। হলদেটে চোখ দুটো লাল হয়ে দু কোয়া মলালেবুর মতো দেখতে হয়। কলের পুতুলের মতো একবার এদিকে যান, কবার ওদিকে যান, আর মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ বের করতে থাকেন—ভুট

ভাট। ফুট ফাট। ইউপ। উউপ। তখন ভয় লাগে, মরেছে! উনি কি আবার 'অ্যান্টি সাইক্‌লে' ফিরে চলেছেন না কি? কোটি কোটি বছর আগে মানুষ যে ফর্মা থেকে এসেছে সেই হুপ হাপ ফর্মে! কে জানে বাবা! দুধ মরে ক্ষীর হয়। জ্ঞান মরে কথার বদলে অব্যয় হয় না কি? অর্থহীন কিছু শব্দ!

শৈলেন সাধুখাঁ আমার ওপরঅলা নন। তিনি যে ধাপে দাপাদাপি করছেন, তার বহু ধাপ ওপরে বসে আছেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তবু শৈলেনবাবু এমন একটা ভাব করেন, যেন, এখুনি মুণ্ড সব গড়াবে। পায়ে পায়ে লোটাবে। চাকরিটি হয়ে যাবে নট! ডাল ভাত মছলি নিমেষেই ফট্। আমি বাবা ভীতু আদমি। ওঁর ওই রকম 'স্করপিয়ন ড্যান্‌স' দেখে এমন ভয় পেয়ে যাই, প্রথমে মনে মনে গাই, মেরা জুতা হ্যায় জাপানী। তারপর পঞ্চাশ মাইল স্পিডে আওড়াতে থাকি, 'প্রভু রক্ষা করো। প্রভু রক্ষা করো।'

প্রভুই আমাকে রক্ষা করছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। একথা একালে আর হেঁকে ডেকে বলা যাবে না। ঈশ্বরে সব অ্যালার্জি আছে। তাঁর নাম শুনলে গায়ে সব লাল লাল চাকা চাকা অ্যালার্জির র‍্যাশ বেরিয়ে যায়। ঈশ্বরবিশ্বাসীর মতো ঘৃণ্য জীব আর হয় না; যেন ধর্ষণকারী মর্ষণকারী। ভ্যালুজ মানে যাকে বলে মূল্যবোধ, খুব দ্রুত পালটাচ্ছে। আমাদের কালে যা নিন্দনীয় ছিল এখন তা গুরুতর প্রশংসার। যেমন মদ্যপান। লোকটা মদ খায় না, ব্যাটা চরিত্রহীন চাষা। লোকটা বিয়ে না করে নারীসঙ্গ করে না, ব্যাটা ইডিয়েট।

আমার যৌবন যখন যাই যাই করছে তখন আর এক যৌবন যায় যায় ভদ্রমহিলা কেন জানি না আমাকে একটু ইয়ে করেছিলেন। ইয়েটা ঠিক কিয়ে আমি বলতে পারবো না। ভদ্রমহিলা ছিলেন টেলিফোন অপারেটার। প্রথমে ফোনে ফোনে আলাপ। অপারেটাররা তো বেশ স্মার্ট হন। মুখে একেবারে কথার খই ফোটে। গলাটা ছিল খুব সুন্দর আর আমিও প্রয়োজনে খুব ন্যাকা ন্যাকা কথা বলতে পারি। কেউ বলুক না বলুক আমি জানি, আমার শরীরে ফিমেল হর্মোনের ভাগ বেশি। একটা ডাক্তারি ম্যাগাজিন পড়ে আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার এক গালে খুব দাড়ি আর এক গাল প্রায় ফাঁকা। একবার গোঁফ রেখে একটু ব্যক্তিত্ব বাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলুম আমার গোঁফের ঘনত্ব খুব কম। টাক পড়া লনের মতো। আমি খুব সাজগোজ করতে ভালবাসি। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছতে ইচ্ছে করে। পরচর্চা পেলে আমি আর কিছু চাই না। তিলকে তাল করার অভ্যাস। আমার কণ্ঠস্বর মিনমিনে। আর কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলতে হলে বিনয়ে একেবারে গলে পড়ি।

মহিলা যে অফিসের অপারেটার সেই অফিসে রোজই আমাকে ফোন করতে হত। আর মহিলা আমাকে রোজই বোর্ডে ঝুলিয়ে রেখে অন্য কল সামলাতেন। মাঝে মাঝে বলতেন 'জাস্ট এ মিনিট প্লিজ।' আমার কণ্ঠ লাল আলো হয়ে ঝুলে থাকত। তিনি মর্জিমতো এটা ওটা সেটা বলতেন। এই উদয় এই অস্ত। কখনও জিজ্ঞেস করছেন, 'কি সিনেমা দেখলেন ?' কখনও প্রশ্ন, 'কি খেলেন ?' কখনও 'আজ বিকেলে কি করছেন ?' 'রবিবার কি করেন ?'

আমি তাঁর কথাবার্তার ধরণধারণ বুঝতে না পেরে সোজাসুজি উত্তর দিতুম। মাসখানেক এইরকম চলার পর আমাকে একদিন প্রচণ্ড ঝাড় দিলেন, 'আপনি একটা উজবুক।'

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালীর ভয় একটাই, চাকরিটা না চলে যায় ! আমি ভাবলুম, মহিলা হয় তো এখুনি আমার ওপরঅলাকে কমপ্লেন করবেন, মশাই আপনার স্টাফ আমাকে টিজ করছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আর করব না।'

সে কি হাসি ! খিল খিল জলতরঙ্গ। আর সেইটাই হল কাল। মহিলা আমাকে ভালোবেসে ফেললেন। কোনও কোনও মহিলা নরম প্রকৃতির বোকা বোকা পুরুষ পছন্দ করেন। ইচ্ছেমতো ধমকানো যায়, দাবড়ানো যায়। বেড়াল যেমন থাবা দিয়ে আরশোলা নাড়াচাড়া করে।

মহিলা বললেন, 'কি করবেন না ?'

'না, যদি কিছু করে থাকি।'

'আপনি কিছু করতে পারেন ? আমার তো মনে হয় না।'

'কি করার কথা বলছেন ?' ভয়ে ভয়ে বললুম। গলা যে কাঁপল, তাও বুঝলুম।

'ওই যে কিছু করা।' আবার হাসি।

দিনটা ছিল মেঘলা মেঘলা। বেশ রোমান্টিক দিন। জলের ধারে বসার দিন। কিছু না করার দিন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার দিন, গল্প করার দিন। ছাত্র হলে ময়দানে চলে যেতুম। হাঁটতে হাঁটতে ফোর্টের ব্যামপার্ট। সেখান থেকে প্ল্যাসি গেট। প্রিনস অফ ওয়েলস জেটি। ম্যান অফ ওয়ার জেটি। চিনেবাদাম। ভাঁড়ের চা।

মহিলা হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি বুঝতে পারেন না।'

'কি বলুন তো ?'

'আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছি।'

'সে তো হয়েই গেছে। রোজই হচ্ছে।'

'সে তো অদৃশ্য। বাতাসে। সামনাসামনি আলাপ। বুদ্ধু।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বলে ফেললুম, 'আমাকে কিন্তু দেখতে তেমন ভালো না।'

মহিলা বললেন, 'আ মোলো।'

মেয়েদের গালাগালেব কি চার্ম, সেদিন বুঝেছিলুম। আমার ভেতরে যত পাখি ছিল সব একসঙ্গে শিস দিয়ে উঠল। টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখতে দেখতে মানুষের মুখচোখের ভাব যেমন হয় আমার চোখমুখের ভাব মনে হয়, সেইরকম হল।

মহিলার কণ্ঠ বাজল, 'সরি রাগ করলেন!'

আমার গলা দিয়ে বাচ্চা শূকরের মতো ছোট্ট একটা শব্দ বেরলো, ঘোঁত।

মহিলা বললেন, 'আমি ধরছি, একটু জল খেয়ে নিন।'

আমি বললুম. 'না, এইবার বলুন।'

'আজ আমাব দুটোয় ছুটি হবে। আপনাব?'

'সাড়ে পাঁচটায়।'

'কাটতে পারবেন?'

'তা হয় তো পারবো।'

'তা হলে মেট্রোর সামনে ঠিক আড়াইটের সময় দু'খানা টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমার পরনে আজ নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। আপনার?'

'নীল সাদা চৌখুপ্পি শার্ট, চকোলেট প্যান্ট।'

'টাক না চুল?'

'চুল।'

'মোটা না রোগা?'

'মাঝারি।'

তখন আমি যে গোয়ালে জোয়াল টানি সেটা নেহাত মন্দ ছিল না। মজুরি যেমন কম ছিল চাবকানিটাও সেইরকম কম দিত। গোয়ালে সবই প্রায় গরু। ষাঁড় থাকত দিল্লিতে। ঠিক আড়াইটের সময় দুটো টিকিট কেটে মেট্রোর সামনে ট্র্যাফিক পুলিসেব মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। বুকের বাঁ দিকটা থেকে থেকে ধধ্‌ধড় করে উঠছে। গলা শুকিয়ে আসছে। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি—মন, অমন কেন করছিস ভাই। কি এমন ব্যাপার। একজন মহিলা আসছেন, যাঁর কণ্ঠ আমার চেনা। রেকর্ডের গানের মতো। যারে আমি চোখে দেখিনি। যার অনেক

গল্প শুনেছি। যেন আখতারি বাঈ, প্রভা আত্রে, শোভা গুরটু। স্বর শুনলে, গায়কী শুনলে বলতে পারবো। সামনে এসে দাঁড়ালে চিনতে পারবো না।

আকাশের ঘোলাটে ভাবটা আরও একটু বেড়েছে। চাপা একটু হলুদ আলো নেমে এসেছে শহরের ওপর। ঘিচির মিচির লোকজন। মনে মনে ভাবছি, শাড়ি যখন নীল তখন সুন্দরী হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাই যেন হয়। যদি প্রেম দিলে, তাহলে ভালোভাবে দাও। টেলিফোন অপারেটাররা সুন্দরীই হয়। রিসেপসানে কি আর কুচ্ছিত বসিয়ে রাখবে ?

কিছু দূরে নীল শাড়িপরা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। মুখে খুব পাউডার ঘষেছে। শ্যামলা শ্যামলা রঙ। ঘন ঘন ঠোঁট মুছচে ছোট্ট রুমাল দিয়ে। কাঁধে একটা লেডিজ ব্যাগ। বারকতক আড়ে আড়ে তাকাল আমার দিকে। আমি ভাবছি, সে না কি। তখন ব্লাউজের দিকে চোখ পড়ল, না, সাদা তো নয়। ভাগ্যিস ! আর একটু হলেই এগিয়ে যেতুম। খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি। আমার এক বন্ধু বলেছিল, চটি আর পায়ের গোড়ালি দেখেই বলা যায়, মেয়ে শিকারী না সাধারণ। ছ্যাতরানো চটি আর ফাটাফাটা গোড়ালি দেখলেই বুঝবি খোঁজাখুঁজি করছে। মিলিয়ে নিলুম। হ্যাঁ, ঠিক তাই। বিধ্বস্ত চটি। বরাতের মতোই ফাটা গোড়ালি। আমি সেইদিন আবিষ্কার করলুম, সাদা আর কালো রঙ ছাড়া, অন্য রঙ সম্পর্কে আমার চোখের একটা দ্বিধা আছে। রঙের ঘোরপ্যাঁচ আমি বুঝি না তেমন। আমি সহজ সরল সাদা কালো মানুষ। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট।

দাঁড়িয়ে আছি। সময় চলে যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে, তত মনের চেহারা পাল্টাচ্ছে। উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আসছে। মনে হতে লাগল, নিজেকেই নিজে বাঁশ দিয়েছি। কি দরকার ছিল এই রকম একটা উটকো প্রস্তাবে হঠাৎ রাজি হয়ে যাওয়ার। মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয় যেন পাঁচটা বাঁদর। কখন কিসে যে নেচে ওঠে। বোধহয় সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম. একেবারে কাঁধের পাশে একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। নীল শাড়ি সাদা ব্লাউজ। আমি তাকাতেই বললেন, "আপনি ?"

কোনও ইতস্তত না করে বললুম. "হ্যাঁ. আমি।"

কোনও জিনিসে কোনও জিনিস ফিট করে গেলে কিছুই আর করার থাকে না ; তবু বলবো, মহিলাকে বেশ ভালোই লাগল আমার। না লাগলেও কিছু করার থাকত না। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখানে একটি সত্যই লাভ হয়েছে, কিছু করা যায় না। সবই করা আছে। পাতা উল্টে চলে যাওয়া। যার অহং বেশি, যার বরাতে তেমন ঝাড়ফুঁক জোটেনি, সমবেত

প্রচেষ্টায় জন-গণ-মন যার কানকো দাঁড়া তেমন করে ভাঙতে পারেনি বা যে বরাত-জোরে সমাজের, পৃথিবীর 'মিউটিলেশান প্রোসেসটা' এড়িয়ে যেতে পেরেছে, সে বলবে সব আমি করছি। 'হু ইজ গড ? ঈশ্বর আবার কে ?' মহিলার কথা বলতে গিয়ে এ-যুগের অচ্ছুত ঈশ্বরের কথা কেন আসছে ! আসবেই, ভাবনা অনেকটা উনুনের ধোঁয়ার মতো। ইলিবিলি করে কোথায় যে যায় ! যখন মানুষের কিছুই থাকে না, তখন তার ঈশ্বর ভরসা। সন্তোষী মা। মা লক্ষ্মী। যখন দেখলে কিছুই হল না, তখন ধ্যাততেরিকা। যখন সে বড়লোক, তখন তার ঈশ্বর ভয়ের ঈশ্বর। দেখো বাবা কেড়ে নিও না। সুসময় স্থায়ী হয়ে গেলে তখন বহুত বোলচাল। যেন নিজেই ঈশ্বর।

মেয়েটি বাঙালী মেয়েদের চেয়ে বেশ একটু বেশি লম্বা। মুখ চোখ বেশ উজ্জ্বল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কোনও মেক-আপ নেই। চুলে তেলচিটে গন্ধ নেই। ব্লাউজের গলায় তেলচিটে দাগ নেই। গড়নটিও বেশ ভালো। গোমড়ামুখো নয়।

মেয়েটি বললে, 'কতক্ষণ এসেছেন ?'

'তা বেশ কিছুক্ষণ।'

'আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে। এতটা আসতে হলো তো।'

'তা হোক ও কিছু না। এখনও শো আরম্ভ হতে পঁচিশ মিনিট।'

'চলুন চা খাই।'

রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি বসে অস্বস্তি হচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসার কারণটা কি ? মহিলার বয়েস নেহাত কম নয়। আমাদের দু'জনেরই 'কাফলাভে'র বয়েস চলে গেছে। প্রশ্নটা মুখে এসেও আটকে গেল। আমি নিজে কিছু করতে পারিনি বলে ভাগ্যে বিশ্বাসী। হয়তো এইরকম একটা কিছু ছিল আমার বরাতে। চা খেতে খেতে আর একটা জিনিস বুঝলুম, বয়েস যতই হোক, নারীসঙ্গের বেশ একটা মাদকতা আছে। ভেতরের দরজা জানলা সব খুলে যায়। এই ঘ্যাচোর-ম্যাচোর পৃথিবীটাকে বেশ ভালো লাগে। মনের চাতালে একদল বোকা কীর্তন শুরু করে দেয়। অতীত আসে, ভবিষ্যৎ সামনে দাঁড়িয়ে চামর দোলায়। নদীর কুলুকুলু, পাখির ডাক, ধীর ঠাণ্ডা বাতাস। যা নেই, সবই ঘিরে আসে। দান করতে ইচ্ছে করে। স্নান করতে ইচ্ছে করে। গান গাইতে ভালো লাগে। প্রচণ্ড গরমেও ম্যালেরিয়া হলে মানুষ যেমন বি রি করে কাঁপে, সেইরকম বিপরীত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। সাময়িক একটা ভূতগ্রস্ত অবস্থা। পৃথিবী তো আসলে একটা বিশাল ধোবিখানা বা বিশাল একটা

ট্যানারি। পাটায় ফেলে ধোলাই, আর না হয় ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে রোদে শুকোনো। কাঁচা চামড়া পাকা করা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মন মচকানোর খেলা। নারীসঙ্গে মনে একটু রঙ ধরে। আলু শক্ত, কচকচে। সেদ্ধ করলে নরম। প্রেম হল আলুসেদ্ধ।

সিনেমা ঘরে গিয়ে বসলুম পাশাপাশি। চা-পর্বেই জড়তা কেটে গেছে। মেয়েটি কথা বলতে ভালবাসে। মনে ঘোরপ্যাঁচ নেই। ঘর অন্ধকার হতেই মাথাটা তার দিকে হেলিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলুম—'কেমন লাগছে আমাকে ?'

মাথাটা আমার মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'মন্দ না। তবে আর একটু যাক।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পারলুম। সাবধান হয়ে গেলুম। ভেতরের 'সেফটি ভাল্‌ভ' টেনে দিলুম। স্মরণ করিয়ে দিলুম, এ তোমার ফুলশয্যা নয়। মেয়েদের চোখে ভালো হবার লোভে ভোগেব পৃথিবী আমার কাছ থেকে দূরে সরে রইল চিবকাল। নিজেকে চাপতে চাপতে চ্যাপ্টা জর্দার কৌটো। নিজের মুখে নেই অন্যের মুখে। আমি শুধু গন্ধটাই পাই।

যে কোনও ব্যাপারেরই প্রথম দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকে। সিনেমা হলের সেই দিনটি নানা কাবণে স্মরণীয়। 'রেডলেটার ডে'। আমি বৃষকাষ্ঠের মতো বসে আছি। নিজেব ভাবমূর্তি না নষ্ট হয়ে যায। মেয়েটি কিন্তু যথেচ্ছ নড়াচড়া কবছিল। কাঁধে কাঁধ লাগাচ্ছিল। হাতে হাত ঠেকাচ্ছিল। আমার দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েদের ছলাকলা তখনও বুঝতুম না, আজও বুঝি না। এমন এক ভূভাগ, যার মানচিত্র আজও তৈরি হল না।

মেয়েটি একসময থাকতে না পেরে ফিসফিস করে বলল, 'অমন কাঠের পুতুলেব মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন কেন ?'

বললুম, 'ভয়ে, যদি কিছু মনে করেন।'

'আমাকে আপনার ভালো লাগেনি ?'

'খুব লেগেছে। আপনি যে এতটা সুন্দর ভাবতে পাবিনি।'

'এটা আবার একটু বাড়াবাড়ি হযে গেল।'

'না, সত্যি না।'

আমার ভেতর থেকে ন্যাকা আমিটা বেবিয়ে এল। যে আমি সারা জীবন সকলকে সন্তুষ্ট করতে চায়। পেতে চায়। ধন, জন, অর্থ, প্রতিপত্তি, ভালোবাসা, সম্মান, সুনাম। আমি মেযেটির হাত সাহস কবে নিজের হাতের মুঠোয় নিলুম। ওই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সকলে সব কিছু পারে না। কেউ ভোগ কবে, কেউ

ভোগের কল্পনা করে।

সিনেমা যখন, এক সময় শেষ হবেই। বাইরে এসে দেখি প্রলয় হয়ে গেছে। সর্বত্র হাঁটুজল। তখনও ঝিপঝিপ বৃষ্টি। রিকশা ছাড়া সব যানবাহন অচল। আমি পড়ে গেলুম মহা সমস্যায়। যে আমার সঙ্গে এতক্ষণ কাটালো, তাকে কি করে বলি, যাও তুমি বাড়ি যাও। থাকে তালতলায়। কোনরকমে একটা রিকশাকে রাজি করালুম। টাকা আর তখন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন দ্রুত স্থানত্যাগের। নিশাচরেরা বেরিয়ে পড়েছে। চেনা জায়গাকেও অচেনা মনে হচ্ছে।

পর্দাঢাকা রিকশা। দু'জনে পাশাপাশি। গায়ে গায়ে। দু'জনেই অল্পবিস্তর ভিজেছি। মেয়েটির জামার পিঠ ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। চুলে চিনির দানার মতো বৃষ্টির জল। আলো পড়লে চিকচিক করছে। সব মানুষেরই মনে একজন পিতা থাকে। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, বছরের প্রথম বৃষ্টিতে এইভাবে ভিজে গেল। মেয়েদের আবার টনসিলের ধাত। কিছু হবে না তো। পকেটে একটা তোয়ালে রুমাল ছিল। বের করলুম। তারপর অসীম সাহসে বার কতক বুলিয়ে দিলুম তার চুলের ওপর দিয়ে। সাহস আরও বাড়িয়ে তার নিটোল পিঠের যতটা পারলুম মুছে দিলুম।

আমার এই যৎসামান্য স্নেহের প্রকাশে মেয়েটি অভিভূত হল। শূন্য মন জয় করতে বেশি সময় লাগে না। আমার মুখের দিকে তাকালো। চোখে জল টলটল করছে। এক কথায় আমাদের আপনি কোষ্ঠীর মতো গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল। সে-ই প্রথমে 'তুমি' বললে।

'জানো, আমাকে কেউ কোনও দিন ভালোবাসেনি। কখনও না। আমি সকলের প্রয়োজন। কখনও গামছা, কখনও ছাতা, কখনও জুতো, ঝাঁটা, ঝুলঝাড়ু পিকদানি।'

নিমেষে মেয়েটির চরিত্র পালটে গেল। দু'চোখে টলটলে জল। পর্দাফেলা রিকশা। বাইরে ঝিমঝিম বৃষ্টি। রিকশার তেরপলের মাথায় আলপিনের মতো ঝরছে। কলকাতার খন্দ-ভরা পথে রিকশা কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে হেলে পড়ছে। বাইরে একটি মানুষের অবিরত সংগ্রামের চিত্র। জমা জলের কলকল শব্দ। প্রাইভেট গাড়ির হর্ন দু'পাশের বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে গমগম করছে।

রিকশায় পাশাপাশি বসে পরিচয়ের পালা শেষ হল। বিয়ে হয়েছিল। চারটি বছর। একটি সন্তান। যবনিকা। বিচ্ছেদ। ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে রিক্ত, শূন্য করে ছেড়ে দিয়েছে। জীবন থমকে গেছে, মেঘ-থমকানো আকাশের মতো। দুঃখের ভারটা ঝেড়ে ফেলতে তার খুব একটা সময় লাগল না। সুখ, দুঃখ,

অনেকটা ঋতুব মতো। শীতের শেষে গ্রীষ্ম এলে আমরা 'কি গরম, কি গবম' বলে দিনকতক ছটফট করি। তারপর সয়ে যায়। আকণ্ঠ ভোজ খাই, সেজেগুজে বিয়ে বাড়ি যাই, বাজারে ঢুকে গলদঘর্ম হই, মশারিতে ঢুকে প্রেম কবি। পারা ১০৯-এই উঠুক আব দশেই উঠুক জীবন থেমে পড়ে না। শীত বলে কি স্নান কবি না! ক্যানিং-এ মেছো ভেড়ি দেখেছিলুম। অজস্র পুকুরের মতো খুঁড়ে রেখেছে। সব শুকনো। বললে অপেক্ষা করুন। আজ পূর্ণিমা। রাতে জোযাব আসবে। ফটফটে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছি বাঁধের ওপর। হঠাৎ ঘটে গেল সেই বিস্ময়। কোথা থেকে জল ঢুকতে শুরু করল চুনচুন করে। সব কটা ভেড়ি ভবে উঠল নোনা জলের আনন্দে। জীবন এমন, একদম কারোকে থেমে থাকতে দেয না। বাতাসের মতো। তারে ঝোলা ছেঁড়া কাপড়ও দোলে, রূপসীব নতুন কাপড়ও দোল খায়।

ছোট্ট কবে নিজেব জীবনের কথা বলে, মেয়েটি ফিরে গেল তাব যত অপ্রাসঙ্গিক কথায়। কবে রিকশা উল্টে মোটা একটা লোক উল্টে পড়েছিল। কবে ঝাড়গ্রামে শালবনেব মাথাব ওপব চাঁদ উঠেছিল। জীবনের চারটে বছরকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে সে যত কথা বলতে লাগল। আমরা যেমন ফোঁড়ার চারপাশে হাত বোলাই।

তার বাড়িব বেশ কিছুটা দূবে বিকশা ছেড়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে তার চপলতা আবার ফিবে এসেছে। আসলে মানুষ চপল হয় তখনই, যখন সে কিছু ভুলতে চায়। দেয়ালের যে জায়গায় সবচেয়ে রঙিন ক্যালেণ্ডার ঝোলে, সেই জায়গাব পলেস্তারাই চটা থাকে। সবচেযে ছেঁড়া তোশকে সবচেয়ে ভালো ফুলকারি ওয়াড।

বিদায়ের মুহূর্তে সার্টিফিকেট চাইলুম, 'কি আমি ভালো তো?'

বিপাশা হাসতে হাসতে বললে, 'একেবারে বুদ্ধু। ফার্স্ট বেঞ্চের গলাবন্ধ কোটপরা ফার্স্ট বয়।'

'আমি ছোট হতে পারি না।'

'বড় হওয়ার অহংকারে?'

'আমার সংস্কাব যা অহঙ্কারের চেয়েও গভীর।'

মাথার ওপর কুচকুচে কালো ভারী আকাশ। পায়ের তলায় ভ্যাটভেটে জমি। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ির অন্ধকার ছায়া। আশেপাশে নেই কেউ। বিপাশা কাছে সরে এসে বললে, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। ভালো কি মন্দ তা জানি না। কেন হয় তাও জানি না, তবে আজ আমি অনা কিছু পেয়েছি।'

শাড়িটাকে অল্প একটু ওপরে তুলে বিপাশা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। চারপাশ যেন শ্মশানের মতো। প্রলয়ের ঠিক পরের অবস্থা। বিপাশা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর যে কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরলো—নাও এবার ম্যাও সামলাও। তারপর মনে হল, তেলই খরচ হল, নাচ তো তেমন জমল না। এই এত পথ পেরিয়ে, এই দুরন্ত রাতে আমাকে ফিরতে হবে। রাত প্রায় সাড়ে দশ। কোনও যানবাহন নেই, এমন কি রিকশাও নেই। মাঝে মধ্যে এক একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে ছ্যার ছ্যার করে জল ছিটোতে ছিটোতে চলে যাচ্ছে। জলে ডোবা রাস্তাকে তখন মনে হচ্ছে লম্বা একফালি ভাঙা আয়না। সেই মুহূর্তে বুঝে গেলুম, আমি কোনও দিন প্রেমিক বিল্বমঙ্গল হতে পারবো না। ভেতরে বসে আছে একটা হিসেবী লোক। ডেবিট ক্রেডিট করে চলেছে। এই আমি ফেললুম এই আমি পেলুম।

সব সময় আমার মনে দু' রকমের বোঝা চলে। একটা বোধ, ভাবনাকে এক বাস্তায় আগে চালিয়ে দেয়। তারপব আর একটা বোধ ভাবনাটা যেখানে গেল সেইখানে দাঁড়িয়ে ছি ছি করতে থাকে। যেন বিপথগামী পুত্রকে পিতা ধমকধামক দিচ্ছেন। বিপথে যাওয়াটা বন্ধ করতে পারে না। দুই আমিতেই সারা জীবন আমাকে নাকাল করেছে। অন্ধকার ফুটপাথে দুই আমিতে শুম্ভ নিশুম্ভ-ব লড়াই। এক আমি রেগে কাঁই। কি লাভ হোলো ? এই তার প্রশ্ন। আর এক প্রশ্ন, কি দবকার ছিল ! দ্বিতীয় আমি-ব উত্তর . সে প্রশ্ন টশ্ন পরে—নেমেছ যখন তোমার পুরো দায়িত্ব পালন করবে ; তাতে যদি মৃত্যু হয় সে-ও ভালো। তোমার ভাবনা বন্ধ করে বাড়ি চলো।

দু'কদম হেঁটেছি কি হাঁটিনি, তিনটে ছায়া আমাকে ঘিরে ধবল। আমার গলার কাছে একটা ছুরি। আমি স্থির। দু'জোড়া হাত আমার পকেট তল্লাসে ব্যস্ত ! সবই গেল। আমার বহুদিনের সঙ্গী ঘড়িটাও চলে গেল। অন্ধকার বাদলা রাত. নির্জন পথ, আমি এক ফকির। যাবার সময় মাথায় একজন চাঁটা মেরেছে। একজন গাল দুটো টিপে 'সোনা ছেলে' বলে আদর করেও গেছে। আমি হা হা কবে মেহের আলির মতো হাসলুম। বেশ উত্তম ঝাড়ফুঁক হল। এখন আমি নিশ্চিন্তে হাঁটি হাঁটি, পা পা করে ঘরে ফিরতে পারি। কেড়ে নেবার মতো আর কিছু নেই আমার কাছে। প্রাণটি ছাড়া।

ওই ঘটনার পর আমি সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, সকলের সব কিছু সহ্য হয় না। কোনও কোনও জিনিস বেশ গুরুপাক। হজম করা শক্ত। একজন এম পি আমাকে বেশ বলেছিলেন, সবাই চুরি করছে। করে বড়লোক হচ্ছে, সেই

দেখাদেখি সামান্য একটা ছিঁচকে চুরির জন্যে জেলে যেতে হল।

সেই রাতে জেলেই গেলুম। তালতলা থানায় গিয়ে ওসিকে ঘটনাটা জানালুম। তিনি প্রায় ধমকের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'অ্যাতো রাতে, এই দুর্যোগে ওখানে কি করতে গিয়েছিলেন ? আমার তো আপনার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে। ভদ্রলোক তো ?'

বলার সাহস হল না যে বলি, 'একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটি।'

রাতটা থানাতেই কাটিয়ে দিলুম। বেঞ্চিতে হাবা-গঙ্গারামের মতো বসে থাকতে দেখে ভোরের দিকে অফিসার ভদ্রলোকের একটু দয়া হল। এক ভাঁড় চা খাওয়ালেন। আমি বুদ্ধি করে কোনও ডায়েরি লেখাইনি। কারুর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। যা হয়েছে হয়েছে। যা হবে হবে।

অফিসার নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কি গেছে ?'

'ঘড়িটা নেহাত মন্দ ছিল না। ঘড়িটার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে। আর যা গেছে, রোজগারের জিনিস, প্রতি মাসেই আসে, মাসের শেষে হাওয়া হয়ে যায়। গোটা পঞ্চাশ টাকা। হ্যাঁ আর একটা জিনিস যা হয় তো আর পাবো না, বিলিতি একটা নেলকাটার। জিনিসটা ভালো ছিল। খুব সার্ভিস দিচ্ছিল। আর একটা দুর্লভ জিনিস ছিল, নীল কাগজে মোড়া ঠাকুরের ফুল। এক তান্ত্রিক দিয়েছিলেন। খুব পাওয়ারফুল। এই জরাব্যাধির সংসারে অনেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করত।'

'যেমন আজ করেছে।'

'অবিশ্বাস করবেন না। করেছে বলেই তো, আজ আপনার মতো মানুষের সামনে বসে চা খেতে পারছি।' সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারলে মানুষের মোটামুটি ভালই হয়। ঠিক সময়ে ঠিক ডোজ ছাড়তে হয়। ত্যাড়াংব্যাড়াং করলে কোনও কাজ হয় না। সে পৃথিবী আর আছে না কি ! অতীতে অনেক কিছু ছিল : এখন সহজ সবল, দেনেঅলা আর লেনেঅলা, দুটো ক্লাস। ঝাড়দেনেঅলা ঝাড়খানেঅলা।

আমার কথাবার্তায় অফিসার খুব সন্তুষ্ট হলেন। চারপাশে দু'জাতের মানুষ ঘুরছে, সাপের জাত আর কেঁচো জাত। আমি জাত কেঁচো। আমার সুবিধে অনেক। ফোঁস করার অনেক জ্বালা। ফ্যাঁসোর ফোঁসোর চলতেই থাকে। বিষ ঢালাঢালি। ছোবল মারামারি।

অফিসার বললেন, 'ঘড়িটা চাই ?'

'পেলে মন্দ হয় না। অনেক দিন কাছে ছিল। ফেথফুল ওয়াইফের মতো।'

'বাবা, কথার বেশ কায়দা আছে তো ! লেখেন-টেখেন না কি ?' অফিসার বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'চেষ্টা করি। জানেন তো জীবনের অনেক যন্ত্রণা ; শোনবার লোক নেই। লেখার চেষ্টা করি। পরে যদি কেউ পড়ে। ওয়ানস আপন এ টাইম, দেয়ার ওয়াজ এ ম্যান। হিজ নেম ওয়াজ শোভনকুমার। ডাক নাম খোকা। বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, এখনও খোকাবাবু। নামের কি পরিহাস !'

'দাঁড়ান আপনার ঘড়িটা উদ্ধার করি। রাত কটা ?'

'সাড়ে এগারোটা, পৌনে বারোটা।'

'স্থান ?'

'ওই চার্চের কাছে।'

অফিসারের হুকুমে দু'জন গদা-মতো হাবিলদার বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে একটা পটকা মতো ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে এল। তার মুখ চোখ আর টলোবলো ভাব দেখে মনে হল, যত রকম নেশা আছে, সব একসঙ্গে চড়িয়ে বসে আছে। পরনে পাজামা। লেসের কাজ করা দামী পাঞ্জাবি। এসব পাঞ্জাবির আবার বুকে বোতাম থাকে না। বুকের ফাটা দিয়ে একটা লকেট উঁকি মারছে। ঈশ্বরের বহুত ভাগ্য। চোরও ভজনা করছে। সাধুও ভজনা করছে।

ছেলেটি বেশ বোয়াব নিয়ে বললে, 'হোয়াটস দ্যা ম্যাটার অফসার ?'

'তোমাকে অনেকদিন আদব করা হয়নি সিরাজু।'

'কেসটা কী।'

সাধারণ ভাষা নয়, টেকনিক্যাল ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ অশ্রাব্য কথাবার্তা হল। কথার ফাঁকে ছেলেটি একটি সিগারেট ধরালো। দেশলাই জ্বালার কি কায়দা। একহাতে। কাঠিটা দু আঙুলে বারুদের ওপর আড়াআড়ি ধরে খচাত শব্দ। ফোঁ করে আগুন। পোড়া কাঠিটা কাঁধের ওপর দিয়ে মেঝেতে ফেলার কায়দাটাও দেখার মতো ! কত কি যে শেখার আছে। ছেলেটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এল লুঙ্গিপরা এক মর্কট। অফিসারের টেবিলে লেডিজ আর জেন্টস মিলিয়ে এক ডজন ঘড়ি ফেলল। তার মধ্যে আমার ঘড়িটাও রয়েছে। অফিসারের নির্দেশে তুলে নিলুম।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'আর মাল ?'

লোকটি একটু উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, 'আবার কি ?'

অফিসার চেয়ারে, লোকটি সামনে খাড়া। অফিসার খপ করে তার পেটের কাছে মাংসটা খামচে ধরে একটা মোচড় মারলেন। লোকটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে

গেল।

অফিসার বললেন, 'আবার কি ? আবার কি ?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখটা বিকৃত করে মোচড় মারছেন আর লোকটা যন্ত্রণায় সামনে বেঁকে যাচ্ছে। 'আবার কি ? আবার কি ?' বের কর পঞ্চাশটা টাকা। হারামজাদা। মেরে দেবার তাল।'

টাকা বেরলো, নেলকাটার বেরলো এমন কি নীল কাগজে মোড়া তান্ত্রিকের ফুলও বেরলো। এ যেন মির‍্যাকল। পৃথিবীতে সবই হয়। এরপর দেখা যাবে ছেলেরাও মা হচ্ছে।

সেই রাতেই বুঝেছিলুম বড়দের গায়ে কখনও হাত পড়ে না। বড় চোর, বড় সাধু, দেশনায়ক, জেনারেল। সকলের গলাতেই ঝুলছে রক্ষাকবচ। মার খেয়ে মরে চুনোপুঁটি। সিরাজু এলো, ফুসফুস সিগারেট ফুঁকলো, প্রিনসের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। আর অফিসার পটকার পেটের মাংস খাবলে খুবলে শেষ করে দিলেন।

অফিসার বললেন, 'সিরাজুর কটা বউ জানেন ? সাতটা।'

'অ্যাঁ, বলেন কি মশাই, সাতটা বউ !'

'সাতটা সাত বয়েসের বউ।'

'কি করে খাওয়ায় ?'

'সে দায়িত্ব জনসাধারণের। একবেলার রোজগার তো চোখের সামনে দেখলেন। যাক আপনার সব মাল বুঝে পেলেন। এরপর আর বলতে পারবেন না অপদার্থ পুলিস।'

একটা রাতের মতো রাত, প্রেমের রাত কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ঢুকলুম। লোকে ধুলো ঝেড়ে বাড়িতে মাল তোলে। মাল আর মানুষের তফাত একালে ঘুচে গেছে। খুব ঝেড়ে আমাকে ঘরে তোলা হল। বিপাশাকে আমি বলিনি, যে আমি বিবাহিত। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের চার পাঁচ বছর পরে মনেই হয় না বিয়ে হয়েছে। বউ মানেই তো লাগাতার বিরক্তি। সবসময় একটা গেল গেল ভাব। কাসুন্দির মতো। যত পুরনো হয়, তত ঝাঁঝ বাড়ে। যেন নাভ্রাতিলোভা। কেবল চাপস। এক এক সার্ভিসেই পনের পয়েন্ট। কোনওটাই ফেরানো যায় না। স্ট্রেট সেটে পরাজয়। এই হোলো না, সেই হোলো না। এই করলে না, সেই করলে না। নিজের চরিত্রে কত ছিদ্র আছে জানতে হলে বিয়ে করো। বিয়ে করে নরম আঁচে প্রেমের মশলা মেখে চিকেন তন্দুর হও।

প্রথমে আমাকে একটা চেয়ারে বসানো হল। তারপর উকিলের জেরা ·

'বেলা দুটোয় অফিস থেকে বেরিয়ে ছিলে কোথায় ?'

'তুমি কি করে জানলে দুটোয় বেরিয়েছি ?'

'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সরোজ কাল আড়াইটের সময় তোমার অফিসে গিয়েছিল।'

সরোজ আমার এক ভবঘুরে শ্যালক। জিজ্ঞেস করলুম, 'কে যেতে বলেছিল ?'

'ধরো ভগবান। না গেলে সত্যটা জানা যেত না। সত্যি কথা তো বলতে শেখনি।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঝাড়ফুঁকের পর এই সিদ্ধান্তই হল, বুড়ো বয়সে আমাকে ঘোড়া রোগে ধরেছে। অন্য কোনও মেয়ে হলে আমার বারোটার জায়গায় আঠারোটা বাজিয়ে দিত। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিত। মোদ্দা কথা, তুমি আমার পাঁঠা। তোমার গর্দানে আমি তেল মাখাবো। দেয়ালে ঝুলবে খাঁড়া। যখন যেমন রাখবো মুখ বুজে সেই ভাবে থাকবে। কোনও ট্যাঁ ফোঁ চলবে না। আই অ্যাম ইওর ওয়াইফ, ইউ আর মাই হাজব্যান্ড। তোমার আবার স্বাধীনতা কি ! মাসপয়লায় টাকা দেবে। উইক এন্ডে তল্পিবাহক হয়ে এখানে ওখানে যাবে, হাওয়া খাওয়াবে, এয়ারিং দি ওয়াইফ। বছরের শেষে আমার নামে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনবে। পুজোয় সাতখানা শাড়ি কিনে দিয়ে মুখটাকে হাঁড়ি করবে। আমার পান থেকে চুন যেন না খসে, তাহলেই কুরুক্ষেত্র ! বিনিময়ে মাসে মাসে সামান্য মাসোহারা। আর আগে যদি টাঁসো তাহলে হাউ হাউ করে আধঘণ্টা কান্না। কিছু ফুল। ফুলসাইজ একটা ছবি হয়ে দেয়ালে কেতরে থাকবে। এসেছিলে তুমি, এই তার প্রতিদান। স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকবে, অবশেষে সন্দেহ, তুমি কি সত্যিই ছিলে ! না, কেবলি ছবি ! পটে আঁকা লিখা।

'ওঁ স্বাহা' বলে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। মা আর বাবা সেই রকম 'ওঁ স্বাহা' বলে ছেলেকে ছেড়ে দেন বউয়ের আগুনে। যাও বৎস ধীরে ধীরে ধিকি ধিকি আঁচে আলুপোড়া হও। বেকড পোট্যাটো উইথ বিনস। বিনস হল, তোমার সন্তানসন্ততি। বউমা, এই আমার পুত্র, আস্ত একটি কাঁচকলা, তোমার আগুনে ওঁ স্বাহা। বুড়োবুড়ি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে রইলেন ; আর তাঁদের বউমা যতরকমভাবে সম্ভব আমার শ্রাদ্ধ ও তিলকাঞ্চন করে নাচের স্কুলে চলে গেলেন।

আমার বউ নাচে। সত্যি নাচে। সব বউই নাচে। আমার বউ শিখে নাচে

আমার সামনে যে নাচ নাচে তা হল সংসার নাট্যম। সে নাচে তালি পড়ে না। মঞ্চে নাচে ভবতনাট্যম। দর্শকরা খুব তালি বাজায়। সে কি কায়দা! চোখ বড় বড় করে একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। কোমর দোলায়। হাত আর আঙুল নিয়ে সে কত রকমের ভঙ্গি! যাও যাও। দেখে নোবো। ছিঁড়ে খাবো। কাছে এসো। দূর হও। সরে যাও। চক্ষুশূল। সবাই বলেন দারুণ নাচে। এ বেয়ার টালেন্ট। সামনের আসনে বসে দু-একবার দেখেছি। ভালোই লাগে। মনেই হয় না আমার বউ। মঞ্চের পাটাতনে যখন পা ঠোকে মনে হয় আমার বুকে ঠুকছে।

সে এক ইতিহাস! এমন একটা জীবন আমার জীবনে ভিড়ে গেল কি করে!

একটা বয়েস থাকে, যে সময় মানুষের অনেক কিছু হতে ইচ্ছে করে। করতে ইচ্ছে করে। সব মানুষেরই বাবা মা থাকে; তাঁরা আবার কানা ছেলের নাম রাখেন পদ্মলোচন। রিকশা গাড়িও গাড়ি। মটোর গাড়িও গাড়ি। একটাকে টানতে হয়; আর একটাকে চালাতে হয়। যখন বোধবুদ্ধিটা অন্যের জিম্মায়, নেহাতই নাবালক তখন রিকশা গাড়ির মতো বাবা মা টেনেছিলেন। বা ব্যাটারি ডাউন মটোর গাড়ির মতো পেছন থেকে ঠেলেছিলেন। ছেলে আমার ব্যোমকেশ হবে। সব পাড়াতেই আর পাঁচটা ছেলের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য অবতার পুরুষের মতো একটা করে ছেলে থাকে। এরা ঘরে ঘরে দীর্ঘশ্বাসের কারণ। আমার ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় ছিল ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশের বাবা দেখা হলেই ইংরেজিতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতেন, 'মাই সান নেভার স্টুড সেকেন্ড ইন এনি একজাম।" ব্যাস ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল আমাদের পেটাই। আমরা হলুম সেই জিনিস যাদের সান্ত্বনা হল, পাঁচ নম্বরের জন্যে ফার্স্ট ডিভিসনটা মিস করলুম, কি আর তিনটে নম্বর হলে সেকেন্ড ডিভিসনটা হয়ে যেতো। কারুর বাপের গর্ব, ইতিহাসে সেভেন্টি নাইন। জাস্ট ফর এ মার্ক মিসড দি লেটার। যাকেই বলছেন, বলছেন ওই ইতিহাসের নম্বর। এদিকে রত্নটি তার অন্যান্য বিষয়ে সাঁইত্রিশ, চল্লিশ। ইংরেজিতে ২৯+১=৩০= পাশ। আমরা এই ক্লাশের ছেলে, আর আমাদের অভিভাবকরা যখনই তাকাচ্ছেন, চোখের সামনে ব্যোমকেশ। আর উঠতে বসতে সে কি তিরস্কার। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, টেরি বাগাও টেরি', ওদিকে ব্যোমকেশ জয়েন্ট এনট্রান্সে ফার্স্ট। মেডিকেলও পেয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং-ও পেয়েছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বড় আতান্তরে পড়েছে। ডাক্তার হবে, না ইঞ্জিনিয়ার হবে। তুমি টেরি বাগাও! টেরিই বাগিয়ে যাও আর শিস দিতে দিতে রাস্তায় টহল মারো। যদ্দিন, বাপের হোটেল আছে, তদ্দিন আর ভয় কি।'

কিছুই না, টানটান করে বোজ যেমন চুল আঁচড়ানো হয়, সেইবকমই হচ্ছিল। ব্যোমকেশের গুঁতোয় হাত থেকে চিকনি খসে পড়ে গেল। দুপুরের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আত্মহত্যা করবো, না নেভিতে গিয়ে নাম লেখাবো, না বোম্বে পালাবো হিরো হতে এই গবেষণায় কোণের ঘবে কত দ্বিপ্রহর যে কেটেছে। মাঝে মাঝে মনে হত ব্যোমকেশরা কেন জন্মায়।

কেউ একবাব সাহস করে প্রশ্ন করল না, 'ব্যোমকেশের বাবা তো জজসাহেব, আপনি কেন কেরানী!' তাহলেই কুরুক্ষেত্র। আমরা যখন ছোট ছিলুম তখন কেবানীদেব খুব উচ্চাশা ছিল। ছেলে আমার ডাল-ভাত খেয়ে পাড়ার মহাকালী পাঠশালে পড়ে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবে। এফ আব সি এস হবে। বার অ্যাট ল' হবে।

প্রতি বছর ম্যাট্রিকের ফল বেরোবার পব বাড়িতে হাহাকাব। আহা দ্যাখো দেখি, টাউন স্কুলেব পল্লব ফার্স্ট। সরস্বতীর সোমেন সেকেন্ড। 'আব তুমি? এবাব অঙ্কে পেলে কত?'

মাথা চুলকে, 'সাতচল্লিশ।'

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আর ধাস্টামো কোরো না।' তখনকার দিনে লোহাবখানা বলে একটা কথা খুব চালু ছিল।

'লোহাবখানায় একটা চাকরিটাকবি চেষ্টাচরিত্র করে দেখে নাও। আর কেন! বেশ গোঁফেব রেখা দেখা দিয়েছে। গলায বযসা লেগেছে। পিপুল তো পেকেছে। গালে আবাব ব্রণ।'

তখনকাব কালে ব্রণ বেরনো একটা সাংঘাতিক অপরাধ। সেকসুযাল অফেনস। ভালো ছেলেদেব ব্রণ বেরতো না। চরিত্রে ফুটোফাটাব লক্ষণ। এই সময় তাল দিতে ওস্তাদ ছিল, বাড়ির ঝি। দরজাব কপাট ধবে বযটাব ছাড়লেন 'পাঁচুঠাকুরের ছেলে বৃত্তি পেয়েছে গো।'

তখন বৃত্তি শব্দটা খুব শোনা যেত। আর সোনার পদক।

ঝিয়ের কথায অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, 'পাবেই তো। পাবেই তো। গবিবেব ঘবেই তো মা সরস্বতীব বাস।'

যিনি বলছেন, তিনি যেন কতই বড়লোক। পুঁই, পোস্ত হল ডায়েট। আদশ হল নিউট্রিশান। কুঁচো চিংড়ি হল প্রোটিন।

এইসব কথার পর শেষ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মচর্য ছাড়া জীবন বৃথা। ওজস। সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীব চোখ নেমে এল মাটিতে। আর না ভাই, কেউ আমাকে হাবসী খোজা করে দিয়ে যা। দরকার নেই আমার লিঙ্গে। নির্লিঙ্গ

হয়ে যাই।

মানুষ যে কেন জন্মায়?

এ প্রশ্নের প্রচুর দার্শনিক উত্তর আছে। আমার নিজের উত্তর, দগ্ধে দগ্ধে মরার জন্য। অনেকে বলেন আমরাই ঈশ্বর। তা হবে। ঈশ্বর ছেঁড়া কাঁথায় ট্যা করলেন। চারপাশে তাড়কা রাক্ষুসীর মতো সাহায্যকারী, সাহায্যকারিণী। ঈশ্বরের মা তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। আর ঈশ্বরকে ঠ্যাং ধরে, মাথা নিচু করিয়ে, পাছায় চাপড় মারা হচ্ছে। ঈশ্বর যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর হৃদয়টিই কেবল চালু ছিল। বাকি সব পার্টস প্যাক করে ঈশ্বরের সিল মারা ছিল। চাপড় মেরে লাংসে বায়ু ভরার চেষ্টা। ঈশ্বর যত কাঁদবেন তত তাঁর বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে।

তার মানে কাঁদার জন্যে জন্মানো।

এরপর ঈশ্বরের নানা ব্যামো হবে। পেট ফাঁপবে। মাসিপিসি হবে। লেংটি পরে ঈশ্বর শুয়ে আছেন কাঁথায়। থেকে থেকে ছুনু। ওয়েল ক্লথে অ্যা মেখে শুয়ে আছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর যদি পরিবারের প্রথম হন তাহলে খাতির। দ্বিতীয় কি তৃতীয় হলে, কেঁদে কেঁদে অস্থির কারুর পাত্তা নেই। সেকালের জয়েন্ট ওয়ার্কশপে ঈশ্বর বড় হতেন দিদিমা কি ঠাকুমার কোলে। আধুনিক সভ্যতা ঠাকুমাদের মেরে ফেলেছে। এখন ঈশ্বরের গতি ব্যাজারমুখ কাজের লোক। চড়, চাপড়, ধোলাই খেতে খেতে ঈশ্বর চতুর্বর্ণাশ্রম পেরিয়ে ফিরে গেলেন নিজের কাছে।

একালের ঈশ্বর আবার ফুল টার্ম কমপ্লিট করতে পারেন না। মাঝপথেই আর এক ঈশ্বর এসে ক্ষুর চালিয়ে প্যাভেলিয়ানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। ঈশ্বরের জীবন-লীলা একালে নতুন নতুন পথ ধরেছে। পুরনো আমলের এই ঈশ্বরটির ইঞ্জিন অভিভাবকদের ঠেলা খেতে খেতে যখন স্টার্ট নিল, তখন সে নিজেকেই নিজে চালাতে লাগলো। এ ড্রাইভিং-এর লাইসেন্স নেই। অ্যাকসিডেন্ট করতে করতে, ফাইন দিতে দিতে চালানো শিখতে হয়।

ব্যোমকেশ বিলেত গেল, আর আমি কোনওরকমে পাশ করে রকে বসলুম। আই এ এস হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া হল না। সৌম্যর মতো সি-এ হয়ে বিরাট কোম্পানির ম্যানেজার হতে পারলুম না। পার্থর মতো পাইপ মুখে ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, তাও হলুম না। অরুণীশের মতো ডাক্তার। যা হলে সব হয়, তার কোনওটাই হওয়া গেল না। ভালো ভালো কেরিয়ার রঙচঙে দুল দুল ঘোড়ার মতো লাক চড়াচড় তাসা বাজিয়ে সামনে দিয়ে দুলতে দুলতে চলে

গেল। আর আমি রোজ লিখতে লাগলুম, আন্ডারস্টান্ডিং ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স। বায়োডাটা অ্যাপেন্ডেড বিলো। একস্ট্রা কারিকুলার, ফুটবল। সুইমিং। ব্যাকে ফুটবল খেলতুম. যোগেন একবার তলপেটে মারলে। পটল প্রায় তুলি আর কি! পেলে হওয়ার সম্ভাবনা ঘুচে গেল। বাড়িতে জলের অভাব। রোজ গঙ্গায় চান করতে করতে একটু হাত-পা নাড়া শিখেছিলুম, সেইটাই হল সুইমিং। অভিভাবকরা বুঝলেন, ছেলেটা ফ্রাসট্রেটেড। খ্যাচোর খ্যাচোর বন্ধ হল। সেই সময় মনে হল, আমার খুব গানের প্রতিভা। ব্লাডে গান আছে। সব মধ্যবিত্ত কেরানীর বাড়িতেই একটা করে ভাঙা হারমোনিয়াম থাকে। খাটের তলায়। ধুলো পড়া। বেড়ালে নিত্য ঠ্যাং তুলে জলসিঞ্চন করে। সপরিবারে কেউ বেড়াতে এলেই, তার নাক তোলা মেয়েকে চেপে ধরা হয়, 'দেখি, দেখি মা, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত করো তো।'

মেয়ের বাবা আর মা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'বেশ গায়। গল্পদাদুর আসবে শোনেননি!'

'কবে, কবে হল?'

'এই তো সেদিন! সুন্দর গেয়েছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

বার কতক কেশে মেয়ে ধরে—বাঁধো নাঁ তরী খাঁনি। শ্রোতারা সব তাল ঠোকেন, মাথা নাড়েন। আহা, আহা করেন। সত্যিই গায়ে কাঁটা দেবার মতোই গান। সবটাই চন্দ্রবিন্দু। প্রায় শ্রাদ্ধের মন্ত্র। ওঁ গযাগঙ্গা প্রভাসাদি।

'তুমি চর্চা ছেড়ো না। চালিয়ে যাও। প্রতিভা আছে। হবে।'

'তাও তো টনসিল। গত তিনদিন মেয়ে আমার ঢোঁক গিলতে পারছে না।'

আমাদের ফ্যামিলিতেও ওই রকম একটা হারমোনিয়াম ছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি, মাঝে মাঝে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী এসে সখি গো, সখি গো করে আকুলি-বিকুলি করছেন আর চোখ বেয়ে হুড় হুড় করে জল বেরোচ্ছে। সেদিন আমাদের বাড়িতে ছানার কালিয়া, আর মালপো হত।

সেই হারমোনিয়াম নিয়ে আমি বসে গেলুম গলা সাধতে। মনে হল, হবে। গলায় মোটামুটি সুর আছে। একেবারে বেসুরো নয়। বেতারে তখন অনুরোধের আসর হত। শুনে শুনে কিছু গান শেখা হয়ে গেল। বাসরের দীপ আর, আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, আমার সমাধি। টেরিফিক সব বিরহের গান। সাংঘাতিক দরদ এসে যেত। চোখ আধবোজা। ডিঙি চালানোর মতো করে মাথাটাকে গোঁত মেরে সামনে ঠেলে, আমার সমাধি, যেদিন রবো না পাশে। চোখে হরেকৃষ্ণ গোস্বামীর মতো জল এসে যেত। মাঝে মাঝে মনে হতো ভাবসমাধি

হয়ে যাবে। এমনই গান যে সামনে গুরুজন এলে গান বন্ধ। তখন একটা গানই রেডি করা ছিল, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়।

মাঝেমধ্যে আত্মীয়স্বজনরা এসে বলতে লাগলেন, খোকা, একটা গান শোনা। আহা ওই গানটা, মধুর আমাব মায়ের হাসি। আহা, ওই গানটা, খেলাঘর মোব ভেসে গেছে হায় নয়নের যমুনায়। নন্দা পিসি আবার বলতেন, 'এই গানটা শুনলে বুকে আমার কে যেন গামছা নিঙড়োয়।' ওই গানটা আবার ভীষণ চড়া। অন্তরায় গলা তুলতে দাঁত মুখ খিঁচোতে হত। শ্রোতাদের মুখ দেখলে কষ্ট হত। আমি হার্টফেল করব না, তাঁরাই হার্টফেল করবেন। অনেকে আবার শুনতে শুনতে সাহায্য করতেন। দু হাত নেড়ে নেড়ে বলতেন, 'তোলো, তোলো। ঠেলে তোলো।' বলতে বলতে তাঁদেরই শবীর মেঝে থেকে আধহাত ওপরে উঠে যেত। আমি যেন ভারী কিছু ঠেলে তুলছি।

পাড়ার ফাংশানে গান গাইবার ডাক পড়ল। উদীয়মান শিল্পী। প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন। আর একটা, আব একটা। রোদন ভরা এ বসন্ত। পাওনা, মাটিব ভাঁড়ে, এক ভাঁড় চা আগে। এক ভাঁড় শেষে। এই রকমই এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, আমাব বউয়ের সঙ্গে আলাপ। সে নাচবে। আমি গাইবো। বিশাল বিচিত্রানুষ্ঠান। বান্ধব সমিতিব পরিচালনায়। মার কাটারি ব্যাপাব। পাড়াব ছেলে হলেও আমি আর্টিস্ট। আর্টিস্ট আর্টিস্ট ভাবটা রপ্ত করে ফেলেছি বেশ। সেলুনে গোঁফটা ঠিক করাতেই ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। হাল্কা একটা রেখার মতো ঠোঁটের কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। আর শিল্প এমনই জিনিস, চুলে বাবরি এসে গেছে। অটোমেটিক। ঘাড়ের কাছে লক্কা পাযবার মতো লাট খাচ্ছে। ড্রেসটাও সেইরকম কবে ফেলেছি। গুরু ধবে, বেওযাজ করে গাইয়ে হইনি। তাতে কি! আমার ব্লাডে গান। সাতটা হিট গান আমি অরিজিনালের মতো গাইতে পাবি। প্রেম যমুনায় হয়তো বা কেউ, আমি এমন গেয়ে দোবো যেন শচীনদেব। যেখানে যেখানে নাকি সুর, সেখানে এ্যাঙ্কস্টলি সেই রকম করে দোবো। তালাত মামুদের, এ জীবনে যদি আব কোনও দিন, অবাঙালী উচ্চারণে তালাতের মতোই গাইতে পাবি। ধনঞ্জয়, সতীনাথ, সুধীবলাল, শচীনদেব, তালাত, জগন্ময়, সব এক হয়ে, আমি। কম কি?

ধুতি, পাঞ্জাবি, বাবরি, সোনালী ফ্রেমের চশমা, সরু গোঁফ, আতব। হালকা পাউডারের প্রলেপ। কোথাও কোনও অভাব নেই। ভাবভঙ্গিও সেইরকম। আজকাল আবার গোলাম আলির হিট, কা করু সজনি গাইছি। হাতটাত এমনভাবে নাড়ি, আলি সায়েবও লজ্জা পেয়ে যাবেন। গানেব কি লচক!

প্রতিভা থাকলে কি না হয় !

ম্যাবাপ বেঁধে ফাংশান। মঞ্চের ডানদিকে ফোল্ডিং চেয়ারে আমরা বসে আছি। সেই চেয়াব, যা বসার আগে পবীক্ষা কবে দেখতে হয়। বেশি নডাচডা করা চলে না। বসে আছি। গবমে ঘামছি। আমার বউ নাচছে। তখনও বউ হয়নি। আমার কপালে নাচছে।

গান যা হয়। ওব তো কোনও নডচড় নেই। খর বায়ু বয় বেগে। নাচ দেখলে আমার তখনও হাসি পেত, এখনও হাসি পায। ছোটদের নৃত্য যদিও বা সহ্য হয়, বডদের নৃত্য সহ্য হয় না। মেয়েরা নাচলে একটা অন্য রস এসে পড়ে। বলেছিল বসগোল্লা, আমি দেখছি গুলাব জামুন। সে না হয় হলো। একটা সোমোত্ত ছেলে মালকোঁচা মেরে, কাজলটানা চোখে এই রকম কবছে, ওইবকম করছে, সে যেন কেমন। তা খব বায়ু বইছে, আমাব বউ হাত এমনি করে করে একবার এদিক যাচ্ছে। একবার ওদিক যাচ্ছে। খাবলে খাবলে প্রজাপতি ধরছে। শবীবটাকে দোমডাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে। হেঁই বোলে মারো টান, দু'হাতে অদৃশ্য কিছু একটা ধরে টান মারছে। লাইনসম্যান যেন ট্রেনেব লাইন চেঞ্জ করতে গিয়ে লিভারে টান মেরেছিল, আটকে গেছে। ওদিকে তুফান আসছে। মার টান। টান মাব। সাবা স্টেজ একেবারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কি হল, নাচেব একটা জাযগায় একটু বেশি বীরত্ব প্রকাশ করে ফেলল। মচাক করে একটা শব্দ। আমার বউ মঞ্চে গেঁথে গেছে। দুটো পা ঢুকে গেছে। সীতার পাতাল প্রবেশ, কিন্তু এমন মেয়ে, তাল ছাড়েনি। নাচ বন্ধ হয়নি। সেই অবস্থাতেও হাতের মুদ্রা করে যাচ্ছে। চোখেব ভঙ্গি করে যাচ্ছে।

শ্রোতারা বলছে, 'গেল গেল। ধর ধর।'

সবার আগে আমি। বগলেব তলা দিয়ে স্ট্রেট দুটো হাত চালিয়ে চাডা মাবছি। তখন আর মনে নেই কিছু। যে যা ভাবে ভাবুক। হেঁই বলে মারো টান হেঁইয়ো। পারবো কেন ভদ্রমহিলার ওজন ছিল। আরও সবাই ছুটে এল। ধীরে ধীরে সীতাকে তুলে, ধরাধবি করে গ্রীন রুমে। গ্রীনরুম আর কি ! মঞ্চের পেছনে ঘেরামতো একটা জায়গা। খুব লেগেছে। চোখে জল। নূপুর পরা গোল গোল সুগৌর দুটি পা বেয়ে আলতার মতো রক্ত ঝরছে। দু একটা চোঁচ ফুটে গেছে নরম জায়গায। জরিব কাজ করা লাল সিল্কের শাড়ি। বুটিদার লাল সিল্কের ব্লাউজ। আমার হয়ে গেছে। আমি ফিনিশ। হাফ ডেড। হৃদয়ে শেল মেরেছে। আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে মুখ দিয়ে ক্ষতস্থান চুষতে যাচ্ছিলুম। কে একজন বললে, 'আরে ধুর, এ কি সাপে কামড়েছে না কি ?'

পাশের ডিসপেনসারি থেকে কে এক শিশি মারকিউরোক্রোম আর এক বাণ্ডিল তুলে নিয়ে এলো। আমাতে আর তাতে জোর কম্পিটিশান। তার ভাগে বাঁ পা, আমার ভাগে ডান। আমি বেশ মোলায়েম করে ড্রেস করছি। করবই তো। বিরহের গান গাই। সে ব্যাটা ছিল তবলিয়া। সে সাধছে ত্রিতাল। আর আমার বউ কেবলি বলছে, লাগছে লাগছে। আবও একটা কারণে আমি পয়েন্ট বেশি পেলুম, টেটভ্যাকের কথা বলে। এটা কারুর মাথায় আসেনি। সে বাতে, আমার কি ভূমিকা। ওরে, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ। আর আমার বউযের লজ্জাটা আমার কাছে অন্তত কমে গেছে, কাবণ, আই ওযাজ দি ফার্স্ট ম্যান, ঈশ্বর যাকে তার বগলের তলা দিয়ে হাত বাড়াবার সুযোগ কবে দিয়েছিলেন। সুন্দরী নাচিয়ে মেয়ে, চুমুচামা হয় তো কেউ কেউ খেযে থাকতে পারে ; কিন্তু আমি যা করলুম, তা দুঃসাহসিক। শুধু কি তাই, আমার পাঞ্জাবির বোতামে তার চুল জড়িয়ে গিযে আর এক শুভ ইঙ্গিত—ওই মাথা, তোমার বুকে আসছে। ধৈর্য ধরে সাধনা চালিয়ে যাও।

আমার ওপরেই দায়িত্বটা এসে গেল। রিকশা করে বাড়ি। যাবার পথে ভোলা ডাক্তারের চেম্বারে পাকা হাতে ড্রেসিং আব টেটভ্যাক। পৃথিবীতে কিছু বোঝা আছে যার ওজন দেড় মণ, দু মণ হলেও যেন এক বস্তা গোলাপ। প্রায় আড়কোলা কবেই বিকশায় তুললুম। ডিসপেনসাবিতে নামালুম। ড্রেসিং-এর সময় মাথাটা বুকে চেপে রাখলুম। বিশাল চুলে, বিপুল খোঁপা, তাতে বিশাল নারকেল তেল। পাঞ্জাবির বুকটা অয়েল ক্লথ হয়ে গেল। টেটভ্যাক দেবার সময় ব্লাউজের হাতটা গুটিয়ে দিয়ে ধরে থাকতে হোলো। আবার বাড়িমুখো। আমাব হাতে নূপুরভরা ভেলভেটের থলে। ঝুমুর ঝুমুর।

সে রাতে অ্যাযসা গান গাইলুম। তিনজন ছাত্রী জুটে গেল। পনেরো টাকা মাইনে। তিন ইনটু পনেরো। পঁয়তাল্লিশ। পঁয়তাল্লিশে তো আর বিয়ে করা যায না। অমন একটা মেয়েকে যত্নে রাখতে হবে। কিন্তু গোঁ চেপে গেল। রেসে অনেক ঘোড়া ছুটছে ; আমি ঘোড়া জিতবোই। তবলিযাটা ট্রাবল দেবে কারণ নাচেব সঙ্গে বাজায়। আমি খর বায়ু দোবো। সব প্রতিযোগী উড়ে যাবে।

যে সেবা করতে পারে তাব অনেক সুযোগ। যে বিনীত, দুর্বিনীত নয় তার অনেক সুবিধে। তাবপর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো তো চিরাচরিত কৌশল। তা ছাড়া পায়ে ধরার একটা ফল পাবো না। আমি হয়ে গেলুম, আমার বউয়ের তল্পিবাহক। ওই নূপুরের ভেলভেট [illegible] আর বাঁয়া তবলার একটা কিট নিয়ে আমি পেছন পেছন এখানে যাই, ওখানে যাই। বডিগার্ডের কাজ করি।

নাচের পর তোয়ালে এগিয়ে দি। ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটি। ওষুধ এনে দেওয়া। পায়ের গোড়ালিতে সৈন্ধবলবণ ঘষে দেওয়া।

চিরকালই আমার বউয়ের বেশ একটা কম্যাণ্ডিং টোন। ভীষণ রাগী। কথায় কথায় রাগ। জাত-শিল্পীদের এই রকমই হয়। মুডি। কখনও হতাশা। কখনও উৎসাহ। কখনও গম্ভীর, কখনও প্রগলভ। আমার বাড়িতে একটা হই হই পড়ে গেল। আত্মীয়-স্বজনরা আসে আর ঘোঁট পাকায়। বাবাকে নাচায়, নাও এবার ছেলের সংসার টানো। বউমা, নাতি, নাতনি নিয়ে সুখে থাকো। কতো সুখ! বাড়ির কেউ আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। এড়িয়ে চলে। শুধু কানে আসে ইতিহাস, অমুকে প্রেম করে বিয়ে করেছিল এই হয়েছে। তমুক আত্মহত্যা করেছে। আর আমি পাগলের মতো, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স, করে যাই। চাকরি কোথায়! প্রেমে ভেতরটা স্পঞ্জের মতো হয়ে আছে, পকেট শূন্য।

এই সময় সংগীতের একজন ভালো গুরু পেয়ে গেলুম। আমার গান শুনে বললেন, 'তোমাকে আমি শেখাবো। বিনা পয়সায়। তবে সময়টা হবে অদ্ভুত। বেলা বারোটা। সপ্তাহে একদিন। বেলা বারোটার সময় আমি ঘুম থেকে উঠি। ওই চা খেতে খেতে তোমাকে একটু তালিম দিয়ে দেবো। সন্ধে থেকে মাঝরাত বড় লোকদের জন্যে। ওই সময়টা আমি গান বিক্রি করি। আমি তখন গাইয়ে না, ফুচকাওলা। বুঝলে কিছু!'

আমার একজন গুরুর প্রয়োজন ছিল। গুরুর প্রয়োজন তরে যাবার জন্যে। গুরুর পরিচয়ে শিষ্যের পরিচয়। খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে। সেই তবলিয়া ব্যাটা আমার কেস খারাপ করে দিচ্ছিল। আমার বউকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছিল, ও আবার গাইয়ে! ও তো নকলি মাল।

প্রথম দিন আমার গুরুর বাড়ি যেতে গিয়ে সোজা বেশ্যালয়ে। নাও, বোঝো ঠেলা। কলকাতার কয়েকটা অঞ্চলে গেরস্থবাড়ি আর বেশ্যাবাড়ি জড়ামড়ি। পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে ব্যাটা মহাপাজি। ফিনফিনে চেহারা দেখে একটু মজা করলে। বলে দিলে, সোজা চলে যান। ডানদিকের দোতলা হলদে বাড়ি। সোজা সিঁড়ি। দোতলা। বেলা প্রায় বারোটা। ফাঁকা রাস্তা। ফুটপাথের পাশে হাইড্রান্ট দিয়ে ফরফর জল বেরোচ্ছে। কোনও সন্দেহই হল না। ডানদিকের হলুদ বাড়িটাও বেশ সুন্দর। নিচের সবকটা ঘরের জানলার খড়খড়ি বন্ধ। সদর হাট খোলা। নিচে একটা উঠোন। দোতলার ভেতরের বারান্দা থেকে সার সার নানা রঙের শাড়ি ঝুলছে। পাতলা ফিন ফিনে। বাতাসে

দুলছে। মনে মনে ভাবলুম, বাবা গুরুজিব বাড়িতে কত মেয়ে! সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় বারান্দা দু'পাশে চলে গেছে। বেশ শ্রদ্ধা হল, গুরুজি তো বেশ বড় বাড়িতে থাকেন! এতক্ষণ পর্যন্ত কারুব সঙ্গে দেখা হল না। অবাধে চলে এলুম। বাঁ দিকের একটা ঘরে খুটুর খাটুব আওয়াজ হচ্ছে। সাহস কবে এগিয়ে গেলুম। গিয়েই মূর্ছা। ঘরেব ডান দিকে দেযালে ঠেসানো বিশাল একটা খাট। বেশ উঁচু। ঝকঝক করছে। পবিপাটি বিছানা! বালিশের থাক। দুধবঙের এক মহিলা এলিয়ে আছেন। শরীবটাকে ঢাকাঢুকি দেবাব শ্রমটুকুও যাঁব করার ইচ্ছে হয়নি। তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে কি সব বলছেন, আর মেঝেতে চেকচেক লুঙ্গি পবা গাঁট্টা চেহাবার একটা লোক উবু হযে বসে খাটের তলা থেকে স্টিলেব থালা বাটি একে একে বের করছে।

একটু হকচকিয়ে গেলুম। দবজার সামনে থেকে পালাতেও পারছি না। মহিলা, আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে, হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'কে? কি চাই? এই তো সবে ভোর হল গো, এব মধ্যেই ক্ষিদে! কি খাবে বলো?'

গাঁট্টা লোকটা বললে, 'শালা, সাবা শহরটা পচে গেছে। কোনও সময অসময় নেই।'

কোনও কথারই মানে বুঝলুম না। সাহস কবে জিজ্ঞেস করলম, 'গুরুজি কোথায়?'

মহিলা অতি অসভ্যেব মতো পা দুটো মুড়ে ওপর দিকে তুলে দোলাতে দোলাতে বললেন, 'ঘুমোচ্ছে।'

'আমাকে যে বারোটার সময় আসতে বলেছিলেন।'

'তা এসো। লজ্জা কিসের।'

'এইখানেই হবে?'

আমি গান হওয়ার কথা জিজ্ঞেস কবলুম। তিনি বললেন, 'এইখানেই তো হয়। চলে এসো। টাকা আছে তো?'

আমি এতক্ষণ ভাবছিলুম, মহিলা গুরুজির স্ত্রী। স্বামী বারোটায় উঠলে, স্ত্রীও বাবোটায় উঠবেন! শিল্পী আর ডাক্তারদের তো আলাদা ঘড়ি! মুখের ওপর টাকার কথা বলায় আমার খুব রাগ হল। আমি স্পষ্ট বললুম, 'তিনি আমাকে বিনা পয়সায় শেখাবেন বলেছিলেন।'

মহিলা খুব একটা অশ্লীল কথা বললেন। আমার কান গরম। তবু আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এটা কি বিষ্ণুকুমারের বাড়ি?'

মহিলা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

বললেন, 'উনি যে আমারও গুরু। তুমি তাঁর বাড়ি খুঁজছো। কি আশ্চর্য, তুমি তো ভুল করে বেশ্যাবাড়ি চলে এসেছো।'

শুনেই আমার পা কাঁপতে লাগলো। হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি।

মহিলা বললেন, 'আমাদের ভয় পেয়ো না। আমরাও মানুষ। এসো একটু বসে যাও। তুমি আমার গুরুভাই।'

আমার না বসে উপায় ছিল না। জলজ্যান্ত একজন দেহব্যবসায়ী ফিনফিনে একটা শাড়ি পরে, ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত করে খাটে মৌজ করে বসে আছেন। ভাবা যায়! ঘরে একটা সোফা ছিল বসলুম। গাঁট্টা লোকটা কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে, একটা টিফিন ক্যারিয়ার দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।

মহিলা চুল খুলতে খুলতে বললেন, 'তোমার গান একটু শোনাবে না কি? কেমন শিখেছো? আমি গান খুব ভালোবাসি।'

ততক্ষণে আমার স্বর ফিরে এসেছে। বললুম, 'দেরি হয়ে যাবে। গুরুজি আমাকে বারোটায় টাইম দিয়েছেন।'

'বারোটা? একটাও হতে পারে। কোনও ঠিক নেই। সারারাত নিজের রেওয়াজ করেন। একটু শোনাও না গো।'

'আর একদিন শোনাবো।'

'তুমি আর এসেছো। এই দুপুরেই ভয়ে মরছো। চোখমুখ কেমন হয়ে গেছে। সত্যি আসবে?'

মহিলা আমার পাশে এসে বসলেন। ভালোও লাগছে। ভয়ও করছে। অজানা মহাদেশে গেলে মনের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা সেইরকম। গায়ে গা ঠেকে আছে। পাখার বাতাসে চুল উড়ে উড়ে গায়ে লাগছে। একবার মনে হচ্ছে থেকে যাই। সময়টা কাটবে ভালো। আবার মনে হচ্ছে, গুরুজির কাছে আমার প্রথম দিন। সেইদিনই বুঝেছিলুম, ধর্ম হল কাঁচকলার ঝোল আর পাপ হল মুর্গমসল্লম।

মহিলা বললেন, 'এর পরের গলিটায় গুরুজির বাড়ি। তুমি কবে আসবে বলো? ওখান থেকে বেরিয়ে আজই এসো না। আমিও ভালো গাই।'

দু' হাত মাথার ওপর তুলে আড়ামোড়া ভাঙলেন। এই সব শরীরের কত আয়েস! আর কিছুক্ষণ বসলেই আমার নেশা ধরে যেত। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। গান। কণ্ঠসংগীত। দেহসংগীত নয়। মেয়েটি বললে, 'গুরুজিকে বোলো ঊষার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

পাশের গলিতে পুরনো আমলের বনেদী বাড়ি। সদর দরজা। উঠোন। উত্তর

কলকাতার কোনও বাড়ির উঠোন শুকনো থাকে না। জল প্যাচপ্যাচ। উঠোন ঘিরে নানা আকারের ঘর। ডানদিকের একটা ঘর থেকে হারমোনিয়াম ভেসে আসছে। বেশ পাকা হাতের বাজনা। ভৈরবী ঠুংরির মুখ। মেজাজ শরিফ। একটু আগে ঊষা। একটু পরে ভৈরবী ঠুংরি। সব ভুলিয়ে দিলে। চাকরি নেই বাকরি নেই। বড়য়, ছোটয় মিলিয়ে বিশ তিরিশটা ইন্টারভিউ। ব্যাটারি খোলা রেডিওর মতো অবস্থা। নব ঘুরিয়েই যাচ্ছি, স্টেশান আর আসছে না।

ঘরজোড়া তক্তপোশ। তার ওপর আসর। গাঢ় নীল লুঙি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বসে আছেন গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান গুরুজি। হারমোনিয়াম তাঁর হাতে। পাশে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। সদ্য স্নান করেছে। ভিজে এলো চুল। আরও দুটি সুদর্শন ছেলে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। গুরু বিষ্ণুকুমার ঘর আলো করে রেখেছেন। প্রসন্ন মুখ। গা-ঢালা মেজাজ। এটা ঊনবিংশ শতক, কি বিংশ শতক, কে হিসেব রাখে! বাইরের শহরে জীবনের কোন স্রোত বইছে জানার দরকার নেই। এমন কি এই বাড়ির অন্য ঘরে কি হচ্ছে, সে খেয়ালও নেই। এখন বারোটা, না একটা! ঘড়ি উল্টে রাখো।

এক চরণ গাইলেন, 'কার তরে নিশি জাগো রাই'। রাই শব্দটার ওপর বিদ্যুৎ গতির একটা কাজ বসিয়ে দিলেন। তারপর বড় বড় চোখে তাকালেন আমাদের দিকে। অন্য কার কি হোলো জানি না, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সুর যেন চাবুকের মতো বেরিয়ে এলো। ওই লাইনটা বাজাতে বাজাতে, আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বললেন, 'এসো।' মেয়েটি প্যানপ্যানে গলায় লাইনটা তোলার চেষ্টা করে তিনবার হোঁচট খেল। আদুরে গলায় বলল, 'আঁমি পাঁরচি নাঁ।' গুরুজি তখন নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রথম লাইনটাই আবার গাইলেন, আরও কাজ বসিয়ে। মেয়েটি এবার আর চেষ্টাই করল না। বুদ্ধির কাজই করেছে। অনেক সাধলে তবেই অমন করে গাওয়া যায়। মেয়েটি সুন্দরী। বেশ ধারালো চেহারা। সেজেছেও খুব সুন্দর। বিষ্ণুকুমারের গায়ে গা লাগিয়েই বসে আছে। আমি বিনাপয়সার ছাত্র। তক্তপোশের একপাশে বসে আছি। স্পর্শ বাঁচিয়ে। বেশ বোঝাই যায় আমি ছাড়া ঘরে যারা রয়েছেন তাঁরা সবাই পয়সাঅলা ঘরের ছেলেমেয়ে।

বিষ্ণুকুমার হঠাৎ বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পারবে? চেষ্টা করো।'

একেই আমি লাজুক প্রকৃতির। তার মানে এই নয়, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেই। আমার প্রেম নেই, দেহবাসনা নেই, লোভ নেই। সব আছে আমার। ভেতরে সব কিলবিল করছে। শিশির ভাদুড়ী হবো, বড়ে গোলাম হবো, ভ্যানগগ হবো, পেলে হবো, স্যার এডমন্ড হিলারি হবো। সব আপসে হয়ে যাবো। মধ্যবিত্ত বাঙালীর স্বপ্ন দেখা স্বভাব। যোগ্যতার প্রশ্ন পরে।

আমি চোখ নিচু করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সুর আর গায়কীটা আমার ভেতবে কিন্তু বসে গেছে। বিষ্ণুকুমার বললেন, 'কি হোলো ! ধরো,ধরে ফেল।' তিনি আবাব একবার গাইলেন। আমার গলার কাছে এসে গেছে। যা থাকে বরাতে। চোখ বুজিয়ে লাইনটা গেয়ে দিলুম। ঘরের সকলেই বাঃ বাঃ করলেন। বিষ্ণুকুমারের মেজাজ এসে গেছে। লাইনটা তিনি আরও জটিল করে গাইলেন। আমি তার প্রতিধ্বনি করলুম। তিনি এবার পরের লাইনটা গাইলেন, তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই, আশা নাই, আশা নাই, কার তরে নিশি জাগো রাই। মনে হল গানটা আমি আগে এইভাবে কোথাও শিখেছি। ঠিক ঠিক গাইতে কোনও অসুবিধেই হল না। মেয়েটি বলল, 'কি সুন্দর গাইলেন আপনি, আমি পাঁরছি না।'

বললুম, 'আপনিও পারবেন। ভয় পাচ্ছেন বলে পারছেন না।'

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'তুমি বরং একটা সহজ গান নাও।'

ধরলেন, 'প্রাণ, তুমি প্রেম সিন্ধু হয়ে, বিন্দু দানে কৃপণ হলে।'

বেলা তিনটে বাজল। কখন স্নান করবেন ! কখন খাবেন ! আমার ওই দূব থেকেই যা দু'চরণ হল। চুপচাপ বসে আছি। গান হচ্ছে। গল্প হচ্ছে। গল্প হচ্ছে। গান হচ্ছে। সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা সবাই উঠে পড়লুম। বেরিয়ে আসছি। বিষ্ণুকুমার বললেন, 'পাঁচটার সময় এসো। তোমাকে নিয়ে আজ একটা আসরে যাবো।'

নিজেকে হঠাৎ বেশ বড় বড় মনে হতে লাগলো। মানুষ একটু স্বীকৃতি চায়। জীবনের একটা মানে খুঁজে পেতে চায়। এতকাল শুধু দূর-ছাই শুনে এসেছি। আজ যেন একটু অন্য সুর শুনলুম। নাচতে নাচতে পথে এসে পড়লুম। সেই মেয়েটি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ফিরেও তাকালো না। মনে হলো চিৎকার করে বলি, প্রাণ তুমি প্রেম সিন্ধু হয়ে বিন্দু দানে কৃপণ হলে ? জুতোপেটা খাবার ইচ্ছে নেই। আজকাল মেয়েরা কথায় কথায় পা থেকে চটি খোলে।

গলির মুখটায় এসে মনে হল উষার কাছে গেলে কেমন হয়। একটা ঘন্টা। দুটো সংস্কারে হাত ধরে টানাটানি। এ বলে পালিয়ে আয়, ও বলে ঘুরে আয়। ছেলেবেলায় গোলোকধাম খেলতুম। অনেকটা লুডোর মতো। ছকে নানা ঘর।

বৈকুণ্ঠলোক, বিষ্ণুলোক। আবার খারাপ খারাপ জায়গাও ছিল, যেমন বেশ্যালয় গমন। ঘুঁটি ওখানে গেলেই খেলুড়েরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো। আর আমি লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসে থাকতুম। কত শৈশব থেকে মানুষকে পাপে ধরে!

সংগীতের জগতে যখন ঢুকেছি তখন ঊষার জগৎটা দেখা উচিত। পাটোয়ারী বুদ্ধির তো অভাব ছিল না। এখন বুঝি, পাটের দালালি কি শেয়ার মার্কেট করলে জমতো ভালো। সংগীত, সাহিত্যফাহিত্য সব বাজে। আসল হল এথি। আমার পাটোয়ারী বুদ্ধি বললে, ঊষা পয়সা নেবে না। এর চেয়ে ভালো সুযোগ জীবনে আসবে? প্রেমের মতো সুযোগও জীবনে একবারই আসে। আফ্রিকা, আমেরিকা, নতুন কোনও মহাদেশে যাবার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু এই গলির পরের গলিতেই ভিন্ন আর এক দেশ। রহস্যে রোমাঞ্চে ভরা। যাই না, গিয়ে একবার দেখিই না।

'কি হয়, একবার দেখিই না,' করতে গিয়ে, জীবনে বহুবার, বহু ফাঁপরে পড়েছি। বাঁদরের কৌতূহলী স্বভাব, বেড়ালের লোভ, কুকুরের হিংসে, শেয়ালের ধূর্ততা সব মিলিয়ে ঈশ্বর এই মাংসপিণ্ডটি তৈরি করেছিলেন। এমন দেশটি কোথাও তুমি'র মতো, এমন মালটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক পিসই তৈরি হয়েছিল। তাজমহল, আইফেল টাওয়ার কি লিনিং টাওয়ার অফ পিসার মতো।

গলির মুখে এসে সেই মেয়েটি হাতে একপাটি চটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক, ওদিক তাকাচ্ছে। একটু আগে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল ব্যাগ দোলাতে দোলাতে। ইভনিং ইন প্যারিসের ঝাপটা মারতে মারতে।

আমাকে দেখে হাতে যেন স্বর্গ পেল। 'এই যে শুনছেন?'

আমি তাকালুম। সুবেশা তরুণী। হাতে একপাটি। পায়ে একপাটি।

'বলুন।'

'ভারী সুন্দর গান করেন আপনি। কোথায় একজন জুতো মেরামতঅলা পাই বলুন তো! আমি আবার খালি পায়ে এক হাতও হাঁটতে পারি না।'

'জুতো মেবামত!'

'দেখুন না হোঁচট খেলুম তো! আর স্ট্র্যাপটা প্যাটাং করে ছিঁড়ে গেল। ভাল্লাগে না বাবা।'

কোথায় এখন জুতোর মেকানিক পাই। এই বিদেশ বিভুঁই জায়গায়।'

'আমি বরং আপনাকে একটা রিকশা করে দি।'

'না বাবা, সে অনেক টাকার ধাক্কা। এ একটা কাঁটা পেরেকের ব্যাপার। বড়

জোর চার আনা।'

আমি হাঁ হয়ে গেলুম। এ যে আমাদের পাড়ার বিভূতিবাবুকেও হার মানায় কয়েক লাখ টাকার মালিক। সেলাই করে গেঞ্জি পরেন। গামছায় তালি মারেন জগন্নাথবাবু বলেছিলেন, 'আজকাল কি ওখানেও অ্যাকাউন্ট ট্র্যানসফার কর যায়?' বিভূতিবাবু হ্যা হ্যা করে হেসে বলেছিলেন, 'আমি বইয়ে পড়েছি বড়লোক হবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল খরচ না করা। খরচ বাড়ালেই বাড়ে। কমালে কমে।'

'এখানে কোনও জুতো সারাইওলা তো দেখছি না।'

মেয়েটি আমাকে প্রায় ধমকে উঠল, 'জুতো মেরামতঅলা কি নৌকো না কি যে ভেসে ভেসে সামনে চলে আসবে! এদিক ওদিক দেখতে হবে। রাস্তাটা ক্র করে ওই ফুটে গিয়ে, ওই ছোট গলিটায় ঢুকলে হিন্দুস্থানীদের একটা দোকা আছে। লক্ষ্মীটি যান না ভাই।'

'অত দূর থেকে আসতে চাইবে কি! সামান্য একটা স্ট্র্যাপ সারাতে।

'আহা ও আসবে কেন? জুতোটা নিয়ে গিয়ে একটা কি দুটো পেরেক ঠুকি আনবেন। আহা, বিপদে পড়ে গেছি বলে বলছি বাবা, অমন করে তাকাচ্ছে কেন! অসুস্থ একটা মেয়ের জন্যে না হয় একটু করলেন!'

'জুতোটা ধরুন, চার আনা পয়সা দি।'

আদিখ্যেতা! 'থাক পয়সা দিতে হবে না।'

জুতোটা হাতে নিয়েই মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। একটু আ রাগে শরীর জ্বলছিল। এখন বেশ একটা ভাল লাগার ভাব এল। আস্ত একটা মেয়ে, তার পা, সেই পায়ের চটি। রাস্তা পেরলুম। সামনেই গলি, রাম ঢা লেন। ঢুকে গেলুম ভেতরে। যত এগোই তত অবাক হতে থাকি। কলকাতা ভেতরে এত বড় বড় পাড়া লুকিয়ে আছে! জানা ছিল না। অবাক কাণ্ড স্যাকরার দোকান। ফটো-বাঁধাই। কাঠের কাজ। ছোট প্রেস।

বকে এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন। মুখ দেখলেই মনে হয় সুখী। বেশ ভরাট, তু মুখ। ঢাবলা ঢাবলা চোখ। পাকা চুলে মনোহর বাবরি। মুখে পান। পা একটি জর্দার ডিবে। আমাকে বললেন, 'শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাটি নিয়ে কোথা চলেছো ভরতচন্দ্র! রামায়ণের যুগ কি আবার ফিরে এলো।'

পাড়া দেখতে দেখতে এতই মশগুল, জুতোর কথা ভুলেই গেছি। যে সময়ে কথা লিখছি, সেই সময় মানুষের জীবনে ছোটখাটো অনেক সুখ ছিল। পাড় ছিল। পরিবার ছিল। মানুষে মানুষে সদ্ভাব ছিল। ইলিশের গন্ধ বেরতো

তালের বড়ার গন্ধ। মানুষ জোরে হাসতো। জোরে কাঁদতো। শখের থিয়েটার হতো। অচেনা মুখ পাড়ায় ঢুকলে কেউ সন্দেহের চোখে তাকাতো না। সি পি এম কংগ্রেসে মারামারি হত না। অনেক রাতে মেয়েরা সর্বাঙ্গে গয়না পরে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরতে ভয় পেত না।

চটিটা তাড়াতাড়ি বুকের কাছ থেকে সরিয়ে বললুম, 'জুতো মেরামতের দোকান খুঁজছি।'

'তা খোঁজো। তবে পায়ের জিনিস বুকে! আস্কারাটা আর একটু বেশি হয়ে গেলেই যে মাথায় উঠে পড়বে বাবা। ইলিশ মাছের মতো হাতে ঝুলিয়ে নাও।'

'জুতো মেরামত কোথায় হয়?'

'চলে যাও সান্যালদের বকে। দেখবে ক্যাবলারাম বসে আছে।'

'স্যান্যালদের বক?'

'ও পাড়ায় বুঝি নতুন?'

'আজ্ঞে ঢুকে পড়েছি।'

'বেশ করেছো। সোজা এগিয়ে যাও। তুমি থিয়েটার করো বুঝি?'

'আজ্ঞে না।'

'বেশ খোকা খোকা চেহারা। আমি থিয়েটার করি বুঝলে! বঙ্গে বর্গী, সাজাহান, সিরাজউদ্দৌলা। মহিম ভটচাজের নাম শুনেছো?'

'বাঃ শুনিনি!'

'এই সেই জিনিস। তুমি কি করো?'

'গান গাই।'

'বাঃ, বাঃ, শিল্পী! চুলে বাবরি দেখেই ধরেছি। তা কি গান? ক্ল্যাসিক্যাল, না আধুনিক!'

'ক্ল্যাসিক্যালে আজ থেকে এলুম।'

'কে গুরু?'

'বিষ্ণুকুমার।'

'আচ্ছা! গুণী মানুষ। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। তার মানে টপ্পা শিখছো। খেয়াল শিখতে হলে পশ্চিমী ওস্তাদ ধরো। লতাফত। শরাফত। একসময় আমার খুব শখ ছিল। সবাই বললে, বাঘের মতো গলা ধ্রুপদে যাও। খেয়াল একটু মিহি চায়। ধ্রুপদ কেউ শুনতে চায় না ভাই! তোম না না, তোম না না। লোকে হাসে। জানলা টিপ করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। তা জুতোটা কার?'

'আমার এক গুরু বোনের। হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে হাঁটতে পারে

না। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'বাঃ রাম ভক্ত হনুমান হয়, তুমি দেখছি তার ওপর যাও জাম্বুবান। তাহলে ধরেছে?'

'কি বলুন তো?'

'আরে প্রেম-রোগ, প্রেম-রোগ।'

'এ মেয়েকে কেউ ধরবে না। অসম্ভব!

'কেউ না ধরুক, সে ধরবে। আমার বাড়িটা চিনে রাখো। ইচ্ছে হলে এসো। আমার একটা দল আছে।' জুতোয় চারটে পেরেক ঠুকিয়ে ফিরে গেলুম। কেউ কোথাও নেই। ফুটপাথ ফাঁকা। পাশেই পান সিগারেটের দোকান। লঙ্কামতো একটা লোক বসে আছে। জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে, ছিলো, পালিয়েছে।

তখন কলকাতায় বেশ কিছু ষাঁড় ছিল। আমি যাবার পরই দুটো ষাঁড়ের লড়াই লেগে গিয়েছিল এই জায়গায়। ধুন্ধুমার কাণ্ড। ভাঙা একটা শিং পড়ে আছে। গাছতলায় ছাতুর হোটেল লণ্ডভণ্ড। ওই লড়াইয়ের সময় মেয়েটি পালিয়েছে। এক পাটি জুতো নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলুম। কি করা যায়! বাড়ি চিনি না। একটা কাগজ পেলে মুড়ে বগলে রাখা যেত। এ একেবারে খোলা তরোয়ালের মতো, খোলা চটি। কতোভাবে মানুষ বিপদে পড়তে পারে, আমি তার ওপর একটা বই লিখতে পারি। সিগারেটঅলাকে বললুম, 'ভাই আমাকে একটা কাগজ দেবে এই জুতোটা মুড়বো। দিদিমণি তো ভেগেছে।'

'তা কি করবে বাবু। আমিই তো দোকান বন্ধ করে ভাগছিলুম।'

লোকটি সিগারেটের একটা বড় খালি প্যাকেট দিল। জুতোটা বেশ আরামসে ঢুকে গেল। উষার কাছে যাবার উৎসাহ আর নেই। যে কোনও অভিজ্ঞতা একবারই ভালো। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি আর আপন মনে হাসছি। এই সেদিন একটা ভিড় বাসে একটি শিশু হাত ফেরতা হতে হতে আমার কোলে এসে পড়ল। শান্ত ছেলে। কোলে বসে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বাস চলেছে। লোক উঠছে, লোক নামছে। অতটা খেয়াল করিনি। বাস এসপ্ল্যানেড গুমটিতে ঢুকলো। যে ক'জন যাত্রী ছিল সব হুড়মুড় করে নেমে গেল। ঘুমন্ত শিশুটিকে কোলে নিয়ে আমি বসে রইলুম একা। নাও এইবার বোঝো ঠ্যালা। গুমটিতে গিয়ে বললুম ভাই এই ব্যাপার। দয়া করে জমা রাখবেন। আমার ইন্টারভিউ আছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বললেন, ছাতা কি ব্যাগ হলে জমা রাখা যায়, জ্যান্ত একটা ছেলে' থানায় জমা দিন। ছেলেটি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ট্যাপা ট্যাপা হাতে চুল ধরে টানছে। নাকে থাব

াবছে। একজন বললেন, কোনও ভুল হচ্ছে না তো! দেখে মনে হচ্ছে, আপনারই ছেলে।

সেই ছেলে কোলে নিয়ে গুমটিতে ঘুরছি আর ঈশ্বরকে ডাকছি। যা হয় একটা ব্যবস্থা করো ভগবান। এমন একটা ফুটফুটে ছেলে ভেসে যাবে। এর মধ্যে আমার কোলে একবার ছুনু হয়ে গেছে। ইন্টারভিউয়ের দফারফা। ঘুরছি আর ভাবছি কি করবো। এমন সময় একটা ট্যাকসি ঢুকলো। উদভ্রান্ত এক মহিলা নেমেই অফিসের দিকে ছুটলেন। দেখেই বুঝেছি, শিশুটির মা। আমি এগিয়ে গিয়ে ছেলে কোলে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। পরীক্ষা করতে হবে তো! কার ছেলে কে নিয়ে যায়! মাকে দেখে শিশুটি চনমন করে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপাতে চায়। এমনই মহিলা, কোথায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, তা না দাবড়াতে শুরু করলেন। হ্যাঁ, আমি যখন নামছি, তখন তো একবার মনে করিয়ে দেবেন! আচ্ছা বেআক্কেলে। এ তো আর হ্যান্ডব্যাগ নয় যে হাতে হাতে ঘুরবে! যার জন্যে আমার ইন্টারভিউ দেওয়া হল না, তার মুখের ভাষার কি ছিরি!

আর একবার ছাতা ধরা। বর্ষাকাল। বাসের পেছনের গেটের বাঁ-পাশের আসনে বসে আছি। ভিজে ছাতা মুড়ে এক একজন উঠছেন, আর, 'দাদা ধরুন তো', বলে আমার দু'হাঁটুর ফাঁকে ছাতাটাকে গুঁজে দিয়ে দু'হাতে রড ধরে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। দেখতে দেখতে আমার কোল ভরে গেল। দশ বিশটা ছাতা। বাস চলছে। বেশ একটা ঘুমের আমেজ। এরই মাঝে এক একটা স্টপেজ আসছে। ঘুমের মেজাজে শুনছি, 'দাদা ছাতা'। এক একটা ছাতা কোলের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছেন। শেষ স্টপেজ। পড়ে আছে একটি মাত্র ছাতা। তিনি ছাতাটা তুলে নিলেন। দু'জনে রাস্তায় নেমে এলুম। নেমেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ কি মশাই! এ কার ছাতা। এই ছেঁড়া ছাতাটা কার! আমার ছাতা নতুন ছাতা ছিল।' এই মারেন তো সেই মারেন, 'আমার ছেলের পইতের নতুন ছাতাটা কাকে দিয়ে মরেছেন?' ভদ্রলোককে পঁচিশটা টাকা দিতে হল। টাকা খুইয়ে, একটা ছেঁড়া ভিজে ছাতা বগলে বাড়ি ফিরে এলুম।

ছেলে ধরা, ছাতা ধরা, অবশেষে জুতো ধরা। বাকি রইল, ধামা ধরা আর পোঁ ধরা। চায়ের দাম মিটিয়ে, কাগজে মোড়া চটিটা বগলে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রায় পাঁচটা। বিষ্ণুকুমারের বাড়ির সামনে গোল মতো একটা মটোর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক রকমের মটোর দেখেছি, এরকম গোলাকার হওয়া গাড়ি, সেই প্রথম আর সেই শেষ দেখা। লাল টকটকে। গাড়িটার সামনে

একটা ভাঙা রক। সেই রকে অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তি উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছেন আর থেকে থেকে দমকা কাশিতে নেচে নেচে উঠছেন। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। চুল ধবধবে সাদা। পরনে ধুতি আর নীল শার্ট।

উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ি। দিনের বেলাতেই আলো ঢোকে না। তখন বেলা তো পড়ে এসেছে। বিষ্ণুকুমার সাজ-পোশাক পরে দালানের চেয়ারে বসে আছেন। বনেদী চেয়ার। একটা হাতল আছে, আর একটা হাতল নেই। চেয়ারে কুরুশের কাজ করা একটা আসন পাতা। তার আধখানা পেছন দিকে ঝুলে পড়েছে। গুরুজি চেয়ারে বসে আছেন। সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর একটা গামছা জড়ানো। একজন ক্ষৌরকার বুরুশ দিয়ে খুব করে দু'গালে, গলায় সাবান বোলাচ্ছে। পাশে আর একজন, তার হাতে একটা বড় টর্চলাইট। ঠোঁটে সাবানের ফেনা। ঠোঁট অল্প ফাঁক করে বললেন, 'বসে পড়ো।'

উল্টো দিকে একটা টিনের চেয়ার। চেয়ারের পেছনে দেয়াল। দেয়ালের উঁচুতে, দেয়ালের সঙ্গেই লাগানো বিশাল লম্বা একটা তারের জাল-লাগানো খাঁচা। খাঁচায় গোটা কুড়ি মুনিয়া পাখি ফুরফুর করে উড়ছে। সিঁ সিঁ করে ডাকছে। চেয়ারে বসলুম। বসার জায়গায় খানিকটা মরচে ধরে খুলে পড়েছে।

ওদিকে গালে ক্ষুর পড়েছে। দ্বিতীয় লোকটি তাক করে টর্চলাইট মারছে। এমন দৃশ্য জীবনে কমই দেখা যায়। যেন থিয়েটার হচ্ছে। গৌরবর্ণ মুখ স্বাস্থ্যের আভায় লাল। এক গালে সান্টা ক্লজের দাড়ির মতো সাবানের ফেনা। তার ওপর টর্চলাইটের ফোকাস। খাঁচা থেকে পাখিরা মাথার ওপর ঝুরঝুর করে কাঁকনি দানার খোসা ফেলছে। আমার কোলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট মোড়া সেই চটি।

দাড়ি কামানো শেষ। গালে ফটকিরি চলেছে। মুখটা যেন ফুলের মতো ফুটে উঠল। পাঞ্জাবির ওপর থেকে গামছা সরে গেল। চুলে বুরুশ বোলানো হল বিষ্ণুকুমার উঠলেন। একেবারে রাজবেশ। আমাকে বললেন, 'চলো, ওঠো। তোমার কোলে ওটা কি? ভগবদ গীতা?'

'চটি।'

'কিনলে?'

'না। একপাটি চটি। ওই যে মেয়েটি দুপুরে গান শিখছিল তার চটি।'

'কে সে?'

'ওই যে কার তরে নিশি জাগো রাই।'

নন্দা! নন্দার চটি তোমার কোলে?'

মুখ ঘুরিয়ে আর যারা ছিলেন তাদের বললেন, 'বুঝলে কিছু ?'

ক্ষৌরকার যন্ত্রপাতি কাপড়ে মুড়তে মুড়তে বললে, 'নিশি জাগো রাই।'

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'আহা ! সে তো রাই নিশি জাগছে। সে না হয় জাগুক। কিন্তু ওর কোলে নন্দার একপাটি চটি কেন ?'

আমি ঘটনাটা বললুম। বিষ্ণুকুমার বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর সবাই হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন। গুরুজি বললেন, 'তোমার তো গীত গোবিন্দের পথ। পদপল্লবমুদারমের বদলে, পদপাদুকাবহনম। কেমন লাগছে ?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। প্রশ্নের মানে বুঝিনি।

'আমি বলছি চটিটা কোলে নিয়ে কেমন লাগছে তোমার ?'

'খারাপ না।'

'বেশ। সরে যখন গেছে, তখন চলো। আগে ওদের বাড়িতেই যাবো।'

গোল গাড়ি গুড গুড করে বড় রাস্তায় বেরলো। বিষ্ণুকুমারের হাতে একটা খবরের কাগজ। গোল করে মোড়া। নলের মতো। প্রথমে বুঝিনি, অবেলায় কাগজ কি হবে ! তাও আবার পুরনো কাগজ। একটু পরেই বোঝা গেল। কাগজের চোঙাটা চালকের কানের কাছে এনে, বিষ্ণুকুমার মুখটা এ-পাশের ফটোর কাছে এনে হাঁকলেন, কেষ্টবাবু, বাঁ দিকে।'

'ইয়েস স্যার।'

গাড়ি বাঁয়ে ঘুরলো।

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'হাত ভালো। চালায় ভালো। কালীপুজোর সময় কানের ওপর পটকা ফাটায় কানে একটু কম শোনে। আর রাতে একটু কম দেখে। সুরে ঠিক, বুঝলে ? তাল আর লয় কানা।'

সাবেক আমলের বেশ বড় বাড়ি। নন্দাদের বেশ বড় বাড়ি। বাড়িতে মনে হয় কারখানা টারখানা একটু কিছু আছে। উঠোনে গাদা প্যাকিং বাক্স। লোকজনের যাওয়া-আসা। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। লোকজন ঠেলে ভেতে ঢুকতে প্রশ্ন করলুম, 'কি তৈরি হয় এখানে ?'

'আশা।'

'আশা ?'

'বুঝলে না ? আশা তৈরি হয়। হোপ। এই বাড়ির নাম কেপ অফ গুড হোপ। মাথার তেল তৈরি হয়। বিখ্যাত আমলা কেশ তেল, মহাভৃঙ্গরাজ। মাথায় মাখলে বিন বিন করে চুল বেরোয়। ভীষণ শক্তিশালী। হাতির দাঁতের

গুঁড়ো দেওয়া আছে। তবে সাবধান। ভুলেও ওই হাত গালে ঠেকিও না যেখানে ঠেকাবে সেইখানেই চুল বেরিয়ে যাবে।'

বাইরের ঘর খুব সাজানো। অ্যাকেয়ারিয়ামে মাছ খেলছে। আমরা বসলুম ঘরে ফোন আছে। বড় একটা রেডিও আছে। খুব সেজেগুজে নন্দা ঘরে এসে ঢুকলো। সিল্কের শাড়ি পরেছে। বড়লোক দেখলে মানুষ কেমন যেন হয়ে যায় নন্দাদের বাড়ির মাথার ওপর গম্বুজ আছে। গম্বুজ থাকা মানেই বড়লোকের লক্ষণ। আমি তড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠেছি। গুরুজি আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন।

'দাঁড়াবার কি হলো। ও কি স্কুলের দিদিমণি!'

লজ্জা পেয়ে গেছি। নন্দা একটা সোনার সরু হার পরেছে। গলায় তিন প্যাঁ তাও বুকের মাঝখানে লকেট নিয়ে দুলছে। লকেটে মনে হয় হীরে বসানো দুর্দান্ত ঝিলিক মারছে। নন্দার চেহারায় একটা কিছু আছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। মনে ভীষণ পাপ আসে।

আমি বসে বসেই বললুম, 'আপনার চটি।'

'ও মা, আমার চটি। কি মিষ্টি ছেলে বাবা। ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর বলবেন না, ষাঁড়ে এমন তাড়া করলে। এক পায়ে জুতো পরেই পালিয়ে এলুম। ষাঁড়গুলো ভারী অসভ্য।' জুতোটা নিয়ে মেরামতের জায়গাটা ভালো করে টেনে টেনে দেখতে দেখতে বললে, 'কত নিলে?'

'আট আনা।'

'ঠকিয়েছে। সিওর ঠকিয়েছে।'

'পেরেক মারেনি। বললে পেরেক পায়ে ফুটবে। সেলাই করে দিয়েছে।'

'ওরা অমন বলে।'

এবার আমরা তিনজন সেই গোল গাড়িটায় এসে উঠলুম। আমি সামনে। গাড়ি চলল। গুড় গুড় করে। পেছনের সব গাড়ি আমাদের মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ হাত নেড়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে, ময়দানের দিকে হাওয়া আরও ভালো।

এইভাবে বেশ কিছু দূর আসার পর আমরা বি টি রোডে পড়লুম। লম্বা পথ। অনেক গাড়ি। বৃদ্ধ কেষ্টবাবুর স্টিয়ারিং ধরার কায়দাটা দেখার মতো। যেন ওঁত পেতে বসে আছেন। আসনে একটু পিছিয়ে বসেছেন। সামনে ঝুঁকে আছেন মুণ্ডটা উইন্ডস্ক্রিনে যেন উঁকি মারছে। স্টিয়ারিং-এর ওপর দিয়ে রাস্তা দেখছেন

যেন সামনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র আছে। কিম্বা চারপাশে মাইন পাতা আছে। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কেষ্টবাবু গাড়িটাকে একেবারে রাস্তার বাঁদিকে এনে একটা গাছের পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কি হোলো ?'

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'ও একটা ব্যাপার আছে। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

'কি গাড়ির ?'

'না না গাড়ি-চালকের।'

কেষ্টবাবু নেমে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে আসছেন। গুরুজি বললেন, 'হুঁকোর জল পালটাতে গিয়েছিল। ওই কাজটা ওকে বারে বারে করতে হয়।'

কেষ্টবাবু আবার এসে স্টিয়ারিং-এ বসলেন। মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন, তারপর স্টার্ট দিলেন। সমস্যা হল ডানদিকে সরে এসে রাস্তায় ওঠার। ঝাঁ ঝাঁ করে পাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। কেষ্টবাবু এক একবার চেষ্টা করছেন আর থেমে পড়ছেন আব বলছেন, 'ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাশ, শয়তান। দেশে আর দেশ নেই।' আমাকে এক ধমক লাগালেন, 'আরামসে বসে না থেকে নেমে ডান দিকটা একটু ম্যানেজ করুন না।'

আমি কি ট্র্যাফিক পুলিস না কি ? যাই হোক নেমে গাড়ির ডানপাশে গেলুম। চলমান পৃথিবীকে থামানো অত সহজ না কি ! কে আমার হাত তোলা আর হাত নাড়াকে পাত্তা দেবে ! আমার কি তকমা আছে ! গাড়ির স্রোতেও ভাঁটা পড়ে। কেষ্টবাবু এক সময় রাস্তায় উঠে পড়লেন আর আমি ঘুরে গিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ওঠার আগেই, কেষ্টবাবু ফুর ফুর করে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। যত আস্তেই চালান আমি ধরবো কি করে ! খানিকটা দৌড়লুম পেছন পেছন। বিপজ্জনক পথ। গাড়ির পর গাড়ি আসছে। শেষে হাল ছেড়ে দিলুম। পেছনের আসনে বিষ্ণুকুমার আর নন্দাদেবী গল্পে মশগুল। গাড়ি গাড়ির ভিড়ে হারিয়ে গেল। কোথায় যে বেপাত্তা হয়ে গেল দেখতেই পেলুম না।

ভীষণ অভিমান হল। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে ! সকাল দেখেই বোঝা উচিত জীবনের দ্বিপ্রহর কেমন যাবে। কেমন হবে অপরাহ্ণ। রাতের চেহারা কি দাঁড়াবে। বি টি রোডের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনটাকে দেখে ফেললুম। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। ধাপে ধাপে সমাধান। সাবধানে কষতে পারলে অঙ্ক মিলবে। অপমান আর উপেক্ষাকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। বড় মানুষরা বড় মানুষের মতোই আচরণ করবেন। তাঁদের হৃদয়হীন হওয়া সাজে। নিষ্ঠুরতা সাজে। চরিত্রহীনতা সাজে। আদর্শ ভারী জিনিস। ওপরে

থাকে না তলিয়ে নেমে আসে নিচে। নিচের তলার অলঙ্কার হল আদর্শ। ধর্ম। ত্যাগ, দয়া, মায়া, গোষ্ঠী-প্রীতি।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে, চলমান গাড়ির ধুলোর ঝাপটা খেতে খেতে আর একবাব গা ঝাড়া দিলুম—আমাকে যেভাবেই হোক বড় হতে হবে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পেছনে একটা দিশি মদের দোকান। লোক গিজ গিজ করছে। এক একজন টলতে টলতে বেরিয়ে এসে বাইরে যেখানে নর্দমার ধারে ঘুগনি আর ডিমভাজা বিক্রি হচ্ছে সেইখানে উবু হয়ে বসে পড়ছে। পিনা হয়েছে এইবার পচাখানা।

জুয়া। জীবনটা একটা মস্ত বড়, জোরদার জুয়া। চাকা ঘুরছে। কোথায় কত নম্বরে এসে থামবে কেউ জানে না। খেলবো না বলে সরে দাঁড়াবারও উপায় নেই। ঈশ্বর এমন এক মেজর জেনারেল যিনি সকলকেই ধরে ফ্রন্ট লাইনে পাঠাবেন।

ধাক্কা না খেলে জীবনদর্শন তৈরি হয় না। আর যোগাযোগ বলে একটা ব্যাপার আছে। ছুটে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছি। ট্রাম এমনিই ধীরে চলে। সামনে একটা রিকশা ছিল ফলে আবও মন্থর। হুটপাট করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, কে আমার ডান হাতটা খপ কবে চেপে ধবলেন। ফিরে তাকালুম। সুন্দর একটি মুখ। বয়সে প্রবীণ। জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। সাদা দাড়ি বুকের কাছে দুলছে। আমি একটু অবাক। যাওয়া আসার পথ ছেড়ে একপাশে দাঁড়ালুম। তাঁর গা ঘেঁষে। হাত তখনও ধরে আছেন। ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ, নরম একটি হাত। তাঁর শরীর থেকে সুন্দর একটি গন্ধ বেরোচ্ছে। দুধের মতো সাদা জামাকাপড়। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'দৌড়ে কখনও ট্রামে উঠবে না। তোমার একটা ফাঁড়া আছে।' ভদ্রলোকের সাবধানবাণী শুনে অবিশ্বাসী মন বলে উঠল, সাবধান, জীবনে বহু জোচ্চরের পাল্লায় পড়েছ, পড়বে। হুঁশিয়ার। এখুনি বলবেন, মাদুলি ধারণ করো ; কিম্বা ছোটখাট একটা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান। আবার এও মনে হল কারুর কারুর জীবনে এমন অযাচিত করুণা আসে। বিশ্বাস থাকলে বেঁচে গেলে, নয় তো ফৌত হয়ে গেলে, কি পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলে রেস্ট অফ দি লাইফ। মনে পড়ে গেল, আমার এক দূর আত্মীয়ের মৃত্যুর কথা। তাঁকেও হঠাৎ এইরকম এক পাগল পাগল চরিত্র রাস্তায় ডেকে বলেছিলেন, 'দাঁড়া। যাচ্ছিস কোথায়!' আমার সেই আত্মীয় তখন কর্মস্থলে যাবার জন্যে ছুটছিলেন। প্রথমে লোকটিকে তেমন পাত্তা দেননি। তার ওপর তুই তোকারি।

উপেক্ষার গলায় বলেছিলেন, 'কেন ? সে খবরে আপনার দরকার কি ?' লোকটি না কি হা হা করে হেসে বলেছিলেন, 'আমি যে দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু তোকে ডাকছে। যা বাড়ি ফিরে যা। একটা বেলা কোনওরকমে মায়ের নাম করে পার করে দে।' এই হুঁশিয়ারি দিয়ে লোকটি হন হন করে চলে গেল। আমার সেই আত্মীয় দোনামোনা করে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির সকলে হো হো করে হাসলেন। সেদিন ছিল মাইনের দিন। সবাই বললেন, 'কে এক পাগল কি বলে গেল, আর তুমি অমনি মায়ের আঁচলের তলায় ঢুকে বসলে। যে শুনবে সেই হাসবে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আত্মীয়ের দৈববাণীর ঘোর কেটে গেল। টাকার প্যাকেটের হাতছানি। ছুটলেন অফিস। শেষ অফিস। আর ফিরলেন না। লেভল ক্রসিং-এ বাস আর মালগাড়ির মধ্যে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলেন। মর্গ থেকে বেরিয়ে এল থ্যাঁতলানো একটা দেহ।

এই সব ঘটনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দুনিয়ায় ফেলতে নেই। নিজের মধ্যে ধরে রাখতে হয়। কারুর কারুর জীবনে অলৌকিক খুব ফলে। লোক্যাল রেডিওয় বিদেশের স্টেশান ধরা পড়ে না। সেইরকম ঈশ্বরের মেসেজ সব জীবনে আসে না। যার আসে তার আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসার সুযোগ পেয়ে গেলুম। ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আকর্ষণীয় প্রভাব ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলুম, 'ট্রামে এত লোক, আপনি আমাকেই বললেন কেন ?'

'তোমার জীবনের টিউনিংটা ঠিক করে দিতে পারলে আমার দলে লোক বাড়বে।'

'আপনার দল ?'

'হ্যাঁ আমার দল, যারা এই ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে উঠতে চায়। মাটির আকর্ষণের চেয়ে আকাশের আকর্ষণ যারা বেশি অনুভব করে। তুমি গীতা পড়ো ?'

'না।'

'গীতা দেখেছো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পইতের সময় একটা পকেট সাইজ গীতা উপহার পেয়েছিলুম। যিনি দিয়েছিলেন, তাঁর ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল। দেবার আর জিনিস পেলেন না।'

'তুমি এখন কি পড়ছো ?'

'জেনারেল নলেজ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

ইউনাইটেড নেশানস, ইউনেসকো, ন্যাটো, হু। হাইড্যাল প্রোজেক্ট।'

'এ সব পড়ছ কেন?'

'চাকরি। চাকরি তো একটা করতেই হবে।'

'তারপর বিয়ে। বিবাহ তো একটা করতেই হবে কি বলো? দাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি।' ভদ্রলোক খপ করে আমার হাতটা আবার চেপে ধরলেন। সেই শীতল, সুন্দর স্পর্শ। মনে হল এই হাতের স্পর্শ আমার কপালে এসে পড়লে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বো। শুধু ঘুম নয়। সঙ্গে অপূর্ব স্বপ্ন।

মধ্যবিত্ত মানুষের মন এত পাপে ভরা। আর এই পাপ সেই শৈশব থেকেই বেশ পরিকল্পনা করে যেমন ঢোকানো হয় তেমনি অসাবধানেও ঢুকে পড়ে। জগৎটা তো এমনিই একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট। পাপ দিয়ে ব্যবসা বেশ জমে। দু পয়সা ভালই কামাই হয়। যেমন বলছি, ছেলেবেলায় আমার মাসিরা বেড়াতে আসতেন, কখনও সখনও বেড়াতে। তা একদিন ছোট মাসি কোণের ঘরে কাপড় জামা ছাড়ছেন। আমি আমার পোষা বেড়ালটার পেছনে তাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়েছি। ছোট মাসি অমনি ধমকে উঠলেন, 'অসভ্য ছেলে। ঠিক অমনি এখানে এসে হাজির হয়েছে।' এই কথা না বললে আমার হয় তো কিছুই মনে হত না। আমি ভয়ে ভয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজার আড়াল থেকে দেখলুম, আর সেই আমার মনে গেঁথে গেল নারী শরীর দেখা পাপ। একটি পাপের জন্ম হল।

সেইরকম, কে একজন শেখালে, বিদেশে একটা ব্যাপার আছে, পুরুষরা পুরুষেই আসক্ত হয়। এর নাম সমকামিতা। পুরুষ পুরুষকে মেয়েদের মতোই ভালবাসে, আদর করে, একসঙ্গে থাকে। এদের বলে হোমোসেকসুয়াল, নাও, বোঝো ঠ্যালা। আমার এক বন্ধু আঁন্দ্রে জিদের বই পড়তে দিলে, স্ট্রেট ইজ দি গেট। জিদ নাকি হোমো ছিলেন। অস্কার ওয়াইলড হোমো ছিলেন। এমন কি টমাস মানের 'ডেথ ইন ভেনিসের' নায়কও না কি হোমো। কি জ্বালা! জ্ঞানের ভাণ্ডারে আর এক পাপের প্রবেশ। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির জ্ঞানের গার্দা ঢুকে। বিদেশী জ্ঞান বড় বেপট জিনিস। এখন কি করা যাবে, পড়তে শিখেছি আর বইয়ের ওপর তো কারুর কোনও কন্ট্রোল নেই। নোটের মতো ঘুরতে ঘুরতে হাতে আসবেই। আরও অভিজ্ঞ একজন বললে, ইতালিতে হোমো শিকার ধরার জন্যে ছেলেরা সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে পায়ে হলদে মোজা পরে। হলদে মোজা হল নিশানা। বোঝো ঠ্যালা। ভারতের ছেলে। বেদবেদান্ত আমার পাঠ্য হওয়া উচিত। গীতা হওয়া উচিত আমার

গাইড। সে সব গেল ভেসে। আমি কোথায় হোমো, কোথায় হলুদ মোজা এই নিয়ে একেবারে জড়োভট্টি হয়ে, এডুকেটেড মিডল ক্লাস।

ভদ্রলোক হাত ধরতেই মনে একটা স্পার্ক—হোমো। আর বলবো কি, এইরকম ঘটনাই তো ঘটে গেল সেদিন। ভূত আছে, ভূত আছে করতে করতেই ভূত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে গেল। তখন আমার সাংঘাতিক অবস্থা। জীবনের পাঁচিলে মাথা খুঁড়ছি। একবার এ দরজা, একবার ও দরজা, কোনও দরজাই খুলছে না। দামড়া ছেলে পাশটাশ করে বসে আছি। বুকে এই এত বড় বড় চুল গজিয়ে গেছে। লোকসমক্ষে পা দেখাতে লজ্জা পাই। সেখানেও কালো কালো চুল। দাড়ি গোঁফে এতবার ব্লেড চলেছে যে উলটো টান না মারলে সাফা হয় না। পুঁই, কুমড়ো খেয়ে খেয়ে পেটে গাছ গজাবার দাখিল। কেউ লুচি আলু ভাজা, কি লুচি মাংস খেয়েছে শুনলে মন টাটায়। কানের কাছে অষ্টপ্রহর গুরুজনদের বাক্যি মিডিঅকার মেরিটের ছেলেদের আজকাল কিছু হওয়া শক্ত। এম এ পাশ আজকাল পিওনের চাকরিই পায় না। আমাকে কে একজন বলেছিল, জার্মান ল্যাঙ্গোয়েজটা শেখো। জার্মানিতে ভারতীয় কুলিকামারি খুব নিচ্ছে। মোটা মাইনে। আমাদের সমাজ মানুষকে ছোট করে ভীষণ আনন্দ পায়। কুলিটুলির ওপরে যে আমি উঠতেই পারবো না, এই সম্ভাবনায় আমার পরিচিতদের কি আনন্দ। একটা ছেলে 'ডুমড' হয়ে যাচ্ছে, আমার পিতার পর একটা পরিবার ভেসে যাবে, কি মজা! গয়না বিক্রি হবে, ঘটিবাটি বিকিয়ে যাবে। দেনার দায়ে বাড়ি বাঁধা পড়বে, অহো কি আনন্দ! এর মধ্যে কারুর ছেলে চাকরি পেলে আদিখ্যেতা করে বলতে আসা। যে কখনও আসেনি, সেও পুঁচকে এক বাকসো সন্দেশ নিয়ে নেচে নেচে বলতে এল, আমার মেজ ছেলে রেলে চাকরি পেয়েছে। বিলাসপুরে পোস্টিং। মেয়েও দেখে রেখেছি। এম এ পাশ। দেবে-থোবে ভালো। একেবারে ডানাকাটা পরী। মেয়ের বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। একমাত্র মেয়ে। বলছে, পরে মেয়ে জামাইকে একটা বাড়ি করে দেবে।

যাঁরা শুনছেন তাঁদের দীর্ঘশ্বাস।

যিনি বলছেন, তিনি এইবার আমার প্রসঙ্গে এলেন। আসতেই হবে। সেই কারণেই তো আসা। 'ওর এখনও কিছু হল না! অ্যাপ্লাই-ট্যাপ্লাই করছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে! দিকে দিকে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে দরখাস্ত করতে বলুন। বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। এরপর ফ্রাসট্রেশান এসে যাবে। আপনার রিটায়ারমেন্টের আর ক'বছর? মাত্র তিন বছর। সর্বনাশ।'

সর্বনাশ যেন ষাঁড়ের মতো তাড়া করে ফিরছে। ওয়াই এম সি এ ভাষা শেখায়। গিয়ে ঢুকলুম। নোটিশ বোর্ডে নোটিশ দেখছি। পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় পাশে এসে দাঁড়ালেন। খুব মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কি খুঁজছো ?'

'জার্মান ল্যাঙ্গোয়েজে ভর্তি হবো।

'এই ব্যাপার। আমি তোমাকে ভর্তি করে দোবো। হাফ ফ্রি করে দোবো।'

হাতে যেন চাঁদের টুকরো পেলুম। ভদ্রলোক বললেন, আমি ভাষা-বিভাগের সর্বেসর্বা। অবিশ্বাসের কোনও কারণই নেই। প্রৌঢ় আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। ফেলতেই পারেন। এইভাবেই তো মানুষ মানুষের সাহায্য পায়। জ্যোতিষী বলেছিলেন, ভাগ্যরেখা যদি চাঁদের ক্ষেত্র থেকে ওঠে, তাহলে মানুষ অন্যের অযাচিত সাহায্যে বড় হয়। আমার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমি জার্মানী যাচ্ছিই। চাকরি তো চাকরি, একেবারে বিদেশে চাকরি। গুটেনবার্গ, মিউনিখ, কোলোন।

প্রৌঢ় আমাকে কলেজ স্ট্রিটে বিখ্যাত জ্ঞানবাবুর রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলেন। দুটো করে মাংসের সিঙ্গাড়া আর চা। জ্ঞানবাবুর সিঙ্গাড়া তখন কলকাতার বিখ্যাত খাদ্য। রেস্তোরাঁয় বসার ব্যবস্থাটা ছিল বিচিত্র। দেয়ালে সাঁটানো টেবিল। সেই টেবিলে পাশাপাশি বসে খাওয়া। খাওয়াটাই বড় কথা, বসাটা নয়। গরম সিঙাড়ায় কামড় মেরেছি। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এত বড় বড় মটরশুটির দানা। প্রৌঢ়ের একটা হাত আমার বাম উরুর ওপর এসে পড়ল। সিঙাড়ার স্বাদে বিভোর। হাত পড়েছে পড়ুক। সামান্য অস্বস্তি। ওটুকু উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু এ কি হাত হাঁটু ছেড়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। গা সিরসির করছে। শেষে এ কি। হাতের লক্ষ্য যে সেই জায়গা। মার লাফ। বইল পড়ে সিঙাড়া। রাস্তায় নেমে দে ছুট। লোকটা আমার সেই বইয়ে পড়া হোমো। ছুটতে ছুটতে ট্রাম রাস্তা। পরে সেই লোকটির আর হদিশ পাইনি। কেউ চেনে না তাকে। ইম্পোস্টার।

এই ভদ্রলোকের ভয়ে আমি সিঁটিয়ে আছি। ট্রাম চলেছে। কিন্তু না, এ পাপীর হাত নয়, পবিত্র হাত। আমার সমস্ত শরীরে যেন একটা আশীর্বাদ নামছে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, 'জীবন অনেক বড়। শুধু জীবিকার জন্যে আমরা জন্মাইনি। শরীরের নিচের দিকটা বড় নয়। বড় হল মাথার দিকটা। গীতা প্রচার সমিতির নাম শুনেছো ?'

'আজ্ঞে না।'

'বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা মৃত্যু-পথযাত্রীর শাস্ত্র করে ফেলে রেখেছি

আমরা। যখন ধরি তখন যাবার সময় হয়ে এসেছে। ধরতে হবে যৌবনে। তোমাদের বয়েসে। পৃথিবীর পরিকল্পনাটা মোটামুটি বুঝেছ কি?'

'আজ্ঞে না। তেমন বুঝিনি।'

'পরিকল্পনাটা খুব সহজ। তুমি এলে। তোমার শরীরটাকে ধীরে ধীরে বড় করা হল আর তোমার মনটাকে ধীরে ধীরে ছোট থেকে আরও ছোট করে দেওয়া হল। ভুল শিক্ষা-পদ্ধতিতে তোমার ধারণা হল জীবন মানে শরীর। শরীর মানে ভোগ। তুমি একটু একটু করে দাস হতে শুরু করলে। অভ্যাসের দাস, জীবিকার দাস, তুমি ক্রমশ ভীতু হতে লাগলে। হারাবার ভয়। তুচ্ছ সব আবর্জনা জড়ো করলে তারপর আতঙ্ক, এই আমার বাড়ি গেল, এই আমার গাড়ি গেল, এই আমার সম্মান গেল, মর্যাদা গেল, এই বুঝি শরীর গেল। দাস হবে, না প্রভু হবে?'

আমার সব গুলিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললুম, 'ঠিক জানি না।'

'হ্যাঁ, জানবে না। তোমাকে জানতে দেওয়া হবে না। জানা মানেই জগৎ পরিকল্পনা থেকে একজন ছটকে গেল। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল একজন দাস।'

হঠাৎ বলে ফেললুম, 'আপনি আমাকে বলছেন কেন। আমি দুর্বল, অসফল। আমি মিডিঅকার।'

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আমি কে? আমিটা কে?'

ঠিক ওই মুহূর্তে ট্রামের কন্ডাক্টার এসে ভদ্রলোকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ট্রাম তখন খালি হয়ে এসেছে। ধর্মতলা এলো বলে। আমি একটু অবাকই হলুম। কত শ্রদ্ধেয় মানুষ! ট্রাম কন্ডাক্টার শুধু চেনেন না, প্রণামও করেন।

গুমটিতে ট্রাম ঢোকার মুখে আমরা টুপটাপ নেমে পড়লুম। এতক্ষণে ভদ্রলোককে পুরোপুরি দেখতে পেলুম। দীর্ঘ শরীর। প্রায় ছ' ফুট। ধবধবে সাদা পোশাক। পায়ে সাদা জুতো। সারা শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে। আমি ইতস্তত করছি। ভাবছি কি করবো। তিনি দ্রুত রাস্তা পেরোতে পেরোতে বললেন, 'চলে এসো। সময় নষ্ট কোরো না।'

সেই প্রথম অনুভব করেছিলুম, পাপের আকর্ষণের চেয়ে পুণ্যের আকর্ষণ কোনও অংশে কম নয়। একটা কিছু পাবো, যা হারায় না। একটা কিছু পাবো, যা অর্থের চেয়ে মূল্যবান; একটা কিছু পাবো যা আণবিক বোমার চেয়ে শক্তিশালী। এমন একটা কিছু পাবো যা পেলে জগতে থেকেও জগৎ-চক্রান্তের বাইরে চলে যাওয়া যায়। আমার ম্যাড়ম্যাড়ে, বিষণ্ণ জীবনে হঠাৎ আলোর

ঝলকানি।

ধর্মতলা স্ট্রিট ধবে হন হন করে হাঁটছি। তিনি হাঁটছেন ঝড়ের বেগে। দু' পাশে নানা দোকান। প্রতিটি দোকানের মালিক, কর্মচারী সসম্মানে বলছেন, সালাম আলেকুম, নমস্তে, নমস্কার। হঠাৎ একজন ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রণাম করে বললে, 'পাশ করে গেছি।'

মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, 'এইখানে থেকো। নিচে নেমো না।'

ধর্মতলা স্ট্রিটেব পেছনটা কেমন আমাব জানা ছিল না। কখনও আসার প্রয়োজন বোধ কবিনি। বিস্ময়কর সব বাড়ি আছে। কোনও কোনও বাড়িব লাগোযা ফালি বাগানও আছে। ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে আমবা একটা তিনতলা বাড়িব ওপরের তলায় এসে পৌঁছলুম। ঘুরে ঘুরে উঠতে বেশ ভয় করছিল। অতি সঙ্কীর্ণ ল্যাণ্ডিং। নীল দবজা। ঝকঝকে সোনাব বর্ণ কড়া। নীল দবজায় ছোট্ট একটি পেতলের ফলক। ফলকে গাঢ় নীল হরফে লেখা, ওঁ শ্রীকৃষ্ণ।

কলিং বেলে আঙুল রাখামাত্রই দরজা খুলে গেল। অতি সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধা দবজা খুলে দিলেন। ভেতরটা মন্দিবের চেয়েও পবিষ্কাব। শ্বেতপাথরের মেঝে। ঝকঝক করছে। সার সার টব। পাম আব ফার্ন। কাঁচের জানলা। ধূপের গন্ধ। বাবান্দাব পবেই বিশাল একটা হলঘব। আসলে সেটা ঠাকুরঘর। ছ' ফুট উঁচু ক্যানভাসে তেলরঙে আঁকা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। সামনে বেদী। বেদীর ওপর অসংখ্য পদ্ম সাজানো। তিনটে অতি সুদৃশ্য কাঁচের বাতিদান জায়গাটাকে চাপা আলোয় ঘিরে রেখেছে। বলতে কি, আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। মনের ওপর পবিবেশেব একটা সাংঘাতিক প্রভাব আছে। কোথায় মধ্যবিত্তেব যাবতীয় ফার্নিচারে ঠাসা, গামছা ঝোলা, আবশোলা ওড়া ঘুপচি ঘর আর কোথায় এই ঘর। শ্রীকৃষ্ণের সামনে মেঝেতে একটা পুরু কার্পেট পাতা।

"আমার নাম পার্থসারথি, তোমার নাম?'

'শোভন। ডাকনামটা বিশ্রী, খোকা।'

'এই আমাব মা। মা আর ব্যাটা পড়ে আছি ওই মহামানবের আশ্রয়ে।'

বৃদ্ধাকে প্রণাম করলুম। প্রণামটা আমার চিরকালই ভাল আসে। প্রণাম করতে আমি ভালোবাসি। সেই দেবীর মতো বৃদ্ধা আমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন। জীবন যতো এগিয়েছিল ততই আমি বুঝেছিলুম, আশীর্বাদের চেয়ে বড কিছু নেই। সব চেয়ে বড় পাথেয়। আশীর্বাদ আর পুণ্যাত্মা মানুষেব স্পর্শ।

গীতাপ্রচারক পার্থসারথি বললেন, 'বেশি কথায় কথার ওজন কমে যায়।

তোমাকে এই পথটা দেখিয়ে রাখলুম। কর্মের পথ, কর্মযোগের পথ। প্রভু কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, পার্থ ক্লীব হয়ো না। যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। কৌরব-পক্ষ বিনা রণে তোমাকে সূচাগ্র মেদিনীও দেবে না। তোমার মধ্যে একটা ক্লীবতা আসছে। একটা জড়তা আসছে। তোমার চোখে সেই উজ্জ্বলতা কোথায়।'

মাথা নিচু করে বললুম, 'কিছুই যে পাচ্ছি না। তেমন মুরুব্বি ধরতে পারছি না বলে এখনও বেকার।'

'নিজের আমিটাকে তো ধরতে পারো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিরহী যক্ষ। সাবধান, যৌবন তোমাকে ভুল পথ চেনাতে চাইবে। সব সময় তোমাকে ঠেলবে। যৌবন দুটো পথ বেছে নিতে চায়, বৈরাগ্য আর বিরহ। মহাভারত পড়েছো?'

'আজ্ঞে না।'

'সারাদিন তুমি কি করো?'

'চিন্তা।'

হাসলেন, 'বাঃ বাঃ। অতি সহজ কাজ। শোনো, ভগবান বশিষ্ঠ লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দৈব আর পুরুষার্থের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা বলেছিলেন :

কৃতী সর্বত্র লভতে প্রতিষ্ঠাং ভাগ্যসংযুতাম।
অকৃতী লভতে ভ্রষ্টঃ ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্॥

'বুঝলে কিছু?'

'আজ্ঞে না। সংস্কৃত আমি জানি না।'

'ইংরেজি জানো?'

'অল্প।'

'বাঙলা?'

'বাঙালীর ছেলে বাঙলা জানব না।'

'সংস্কৃত না জানলে বাঙলা জানা যায় না। তুমি তোমার মতো করে জানো, তাকে জানা বলে না। শ্লোকটির অর্থ হল, পুরুষার্থী মানুষ সর্বত্র ভাগ্য অনুসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে অকর্মণ্য, সে সম্মান থেকে ভ্রষ্ট হয়। ক্ষতে নুন ছিটিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, অকর্মণ্য সেই রকম অসহ্য দুঃখ ভোগ করে।'

'আপনিও আমাকে অকর্মণ্য বলছেন? আমি তো নানাভাবে চেষ্টা করছি।'

'তুমি চাকরির চেষ্টা করছো? সেইটাই জীবনের সব নয়। জ্ঞান বাড়াও, মানুষ

হবার চেষ্টা করো। কোনও দিন আয়নার সামনে দাঁড়াও ?'

লজ্জা পেয়ে গেলুম। সারাদিন তো আয়নার সামনেই কাটে। এই চুল ঠিক করছি। এই গোঁফে ছোট কাঁচি চালাচ্ছি। আস্তে আস্তে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাঁড়াই।'

'দেখতে পাও না, তোমার মতো এই রকম চুল সেকালের লম্পট বাবুরা রাখতো। বাঈজী নাচাতো। তোমার গোঁফ। গোঁফ যদি রাখতে হয় পুরুষ মানুষের মতো গোঁফ রাখো।'

'আমি যে গান শিখি।'

হা হা করে তিনি হাসলেন। 'গান শেখো ? ওস্তাদ হবে ? চুলে তোমার ওস্তাদি। গোঁফে তোমার ওস্তাদি ! ফৈয়াজ খাঁর ছবি দেখেছো ? বড়ে গোলামের ছবি দেখেছো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কুস্তির পালোয়ানের সঙ্গে কোনও তফাত খুঁজে পেয়েছো ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ? তোমার লজ্জা করে না ! এই রকম একটা না মহিলা, না পুরুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। কালই চুল ছোটো করে কেটে ফেলবে, আর গোঁফ রাখার ইচ্ছে হলে ভালো করে রাখবে, তা না হলে পুরো কামিয়ে ফেলবে। প্লেন পাঞ্জাবি পরবে একটু মোটা কাপড়ের। যে কাপড়ের তলা থেকে গেঞ্জি ফুটে ওঠে, সে কাপড় ব্যবহার করবে না।'

বৃদ্ধা একটা পাথরের থালায় করে, ভিজে মুগ আর মটর নিয়ে এলেন। সঙ্গে নুন আর আদাকুঁচি। নানা রকম ফল। নরম পাকের সন্দেশ। পাথরের গেলাসে গেলাসে জল। পার্থসারথি বললেন, 'অনেক বকেছি, এবার তুমি প্রসাদ খাও। আবার আমার বেরোবার সময় হল। ভবানীপুরে এক জায়গায় গীতার কর্মযোগের ওপর বলতে হবে।'

কারুর সামনে বসে গপগপ করে খেতে আমার ভীষণ লজ্জা করে। অর্ধেক রমণী আমি অর্ধেক পুরুষ। মুখ নিচু করে সাবধানে কোনও রকম শব্দ না করে আমি খেয়ে নিলুম। পার্থসারথি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগলো ?'

'খুব ভালো।'

'বেশ পবিত্র লাগছে না !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ?'

'তুমি মাছ, মাংস খাও বেশ করে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ?'

'পেলে খাই।'

'খাবে না। নিরামিষাশী হবার চেষ্টা করো। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,

পুত্র মাংসোপমং জানন খাদতে যোহবিচক্ষণঃ।
মাসং মোহসমাযুক্তঃ পুরুষঃ সোহধমঃ স্মৃতঃ॥

পুত্রের মাংস আর অন্য পশুর মাংসে কোনও তফাত নেই। এই জেনেও যে মূর্খ প্রাণী মাংস ভক্ষণ করে সে নরাধম। জীবনের মন্ত্র হোক অহিংসা। মা হিংসি। ভীষ্ম কী সুন্দর বলছেন শোনো। মহাভারতের কোনও তুলনা হয় না। অসাধারণ গ্রন্থ। ভীষ্ম বলছেন,

যথা নাগপদেছন্যামি পদামি পদগামিনাম।
সর্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদবজাতামি কৌঞ্জরে॥
এবং লোকেস্বহিংসা তু নির্দিষ্টা ধর্মতঃ পুরা।

উপমাটি একবার দ্যাখো, হস্তীর পদচিহ্ন পাদগামী সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন ঢুকে যায়। প্রবিষ্ট হয়ে যায়। সেই রকম পুরাকালে জগতে ধর্মত অহিংসারই নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ অহিংসাধর্মের মধ্যেই সর্বধর্মের সমাবেশ। তোমাকে আমার অনেক অনেক কথা বলার আছে। শেখাবার আছে। পড়াবার আছে। কি তুমি চাকরি চাকরি করছ। দাসত্ব। নিজেকে প্রস্তুত করো। আজ থেকে তুমি একটা ডায়েরি রাখার চেষ্টা করো। দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা ভালো ডায়েরি দেবার চেষ্টা করি।'

পাশের ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই ওঘর থেকে ডাক এলো। প্রায় এই ঘরের মতোই বড়। সমস্ত দেয়াল জুড়ে সেল্ফ। আর তাকে তাকে বই। অজস্র বই। তার মধ্যে অনেক আইনের বইও রয়েছে। সুন্দর করে সাজানো। এতটুকু ধুলো নেই কোথাও। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটা পড়ার টেবিল। চারপাশে চেয়ার সাজানো। একটি চেয়ারে একজন বিদেশী মহিলা খসখস করে লিখে চলেছেন। তাঁর চারপাশে বই স্তূপাকার। ফর্সা, সুন্দর, চেহারা। চোখে ফিনফিনে সোনার ফ্রেমের চশমা। গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

পরিচয় করিয়ে দিতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে ভারতীয় কায়দায় হাত জোড় করে নমস্কার করল। আমেরিকার মেয়ে, নাম লরা। ঘুরে ঘুরে বই দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলুম, 'এত আইনের বই কেন?' গীতার সঙ্গে আইনকে কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

'এক সময় আমি আইনের লোক ছিলুম, প্র্যাকটিসনার অফ ল। এই দেখ আমার পুরনো প্যাড।' পুরনো প্যাডে নীল অক্ষরে লেখা, পার্থসারথি ব্যানার্জি,

বার অ্যাট ল। ভদ্রলোক ব্যারিস্টার। যা তা ব্যাপার নয়। ব্যারিস্টারদের রোজগার আমি জানি।

'এখন আর প্র্যাকটিস করেন না?'

'না। নিয়মটা কি জানো, ধরবে, ধরে ছেড়ে দেবে। পেয়ে ত্যাগ। গেট ইট অ্যাণ্ড লিভ ইট। কম্প্যানি ল-তে আমি এক নম্বর ছিলুম। রোজগারের সীমা ছিল না। শীর্ষে উঠে নেমে এলুম। এভারেস্টের মাথায় ওঠো, নিজের পতাকাটি স্থাপন করো, নেমে এসো। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,

কায়েন ত্রিবিধং কর্ম বাচা চাপি চতুর্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধং চৈব দশকর্মপথাংস্ত্যজেৎ॥

শরীরের দ্বারা উৎপন্ন তিন প্রকারের কর্ম, বাক্যের দ্বারা চার প্রকারেব কর্ম এবং মনের দ্বারা তিন প্রকারের কর্ম, সব মিলিয়ে দশ ধরনের কাজ পরিত্যাগ করবে। শরীর কোন তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে! অপরের প্রাণনাশ করা, চুরি করা আর পরস্ত্রী সংসর্গ করা। বাক্য কোন চারটি কাজ করবে না! অসৎ কথা বলা, কর্কশ কথা বলা, খলতাপূর্ণ কথা বলা, আর মিথ্যা কথা বলা। এইবার মন। মানসিক পাপ কি কি? অপরের ধন গ্রহণের কথা চিন্তা করা। সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুতা করা। কর্মফলেব ওপর বিশ্বাস না রাখা।

তস্মাদ বাক্যায় মনসা নাচরেদ শুভং নরঃ।
শুভাশুভান্যাচরণ হি তস্য তস্যাশ্নুতে ফলম॥

মানুষের কর্তব্য, মন, বাক্য আর দেহ, এই তিন দিয়ে কোনো অশুভ কর্ম করবে না। কারণ শুভ বা অশুভ যে কর্মই করো, ফল ভোগ করবে তুমি। তোমাকেই ভোগ করতে হবে, অন্য কেউ এসে সেই ফল ভোগ করে দিয়ে যাবে না। না, আর না। অনেক বলা হল। লরা, তুমি আমাকে একটা ডায়েরি বের করে দেবে!'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। বিদেশিনী এত কাছ থেকে আগে আমি কখনও দেখিনি। সিল্কের শাড়ি পরেছে। ঠিক সামলাতে পারছে না। আমার চোখ বারেবারেই চলে যাচ্ছে তার শরীরের দিকে আর মনে মনে নিজেকে চাঁটা মারছি। কেন এই মুরগীর স্বভাব। ছাইগাদা দেখলেই দু' পা দিয়ে খচরমচর করা।

লরা সুন্দর একটা ডায়েরি বের করে আনল। দুধের মতো সাদা মলাট। ঘি ঘি রঙের মোটা মোটা পাতা। সরু সরু লাইন টানা, হাল্কা সবুজ রঙে। সোনার জলে তলায় একপাশে ছোট্ট করে লেখা কুইল মার্ক।

পার্থসারথি ডায়েরিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'বিদেশের শ্রেষ্ঠ জিনিস। মর্যাদা রেখো। মুক্তোর মতো হাতের লেখায়, প্রতিদিন যা করলে, যা করতে চেয়েছিলে কিন্তু করা হোলো না, লিখে রাখবে তারিখ দিয়ে। আমাকে দেখাবে।'

লরা মুখ তুলে হাসল। কোন দেশে এত সুন্দর মেয়ে জন্মায়। মসৃণ দেহত্বক। সোনার বর্ণ। নীল সাগরের চোখ। যেন এখনি চিল উড়বে পাখা মেলে। সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভয়ে ভয়ে নেমে এলুম নিচে। উঠেছিল এক মানুষ, নেমে এল আর এক মানুষ। নিচে এলোমেলো, ঘ্যাচোরম্যাচোর কলকাতা যেমন চলছিল সেই রকমই চলছে। কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় ভীষ্ম! কোথায় যুধিষ্ঠির! পড়ে আছে কুরুক্ষেত্র। মনে ঘোর লেগে গেছে। মানুষ ইচ্ছে করলেই, কি না কি হতে পারে। ইচ্ছেটাই যে আসে না ঘোড়ার ডিম। কোথায় শ্রীকৃষ্ণের অমন মোহন মূর্তির কথা ভাবব। তা না ভাবছি লরার কথা। আ মরণ। মানুষ বুকে শালগ্রাম শিলা ধারণ করে। ইষ্টের ছবি বুকে ধরে নিয়ে যায়। আমার বুকে শ্রীমতী নন্দার চটি। ওর ওই ছেলে-ছেলে চেহারা আমাকে পাগল পাগল করলে। মাথায় করে একজন মস্ত একটা প্লাইবোর্ড নিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশ লগরবগর করছে। এক্ষুনি আমার কপালটা যাচ্ছিল।

সোজা একটা সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম। 'লাগাও কদম ছাঁট।'

'সে কি, আপনার এমন সুন্দর চুল।'

'হোক সুন্দর। শেষ করে দাও।'

আধঘণ্টার মধ্যে আয়নায় নিজেকে আর চিনতে পারি না। একটু আগে ছিল মেয়ে, এখন ছেলে।

'গোঁফ উড়িয়ে দাও।'

নিমেষে গোঁফ সাফ। সব শেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল পাঞ্জাবি আর চলবে না। কলারঅলা শার্ট চাই। সঙ্গে মালকোঁচা মারা ধুতি। বাস, প্রেমের সমাধি হয়ে গেল। মেয়েদের আঁচল ধরে ঘোরা জীবনের ইতি। ধ্যাধধেড়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রমে চড়ে ফিরতে ফিরতে নিজেকেই নিজে বোঝালুম, মহিলা বস্তুটি কি! বেশ করে বিশ্লেষণ করো। লম্বা চুল। কখনও তেল চুকচুকে। কখনও সাবান ফুরফুরে। চুলে কি আছে? গন্ধ আছে। উকুন আছে। খুশকি আছে। আর বায়বীয় কি আছে? কাব্য। এই হল যুবতীর চুলের উপাদান। বৃদ্ধার চুল? শণের নুড়ি। সে চুলে কাব্য নেই। আছে ভয়। আছে মৃত্যু।

চোখ? চোখ হল দেখাব যন্ত্র। চোখের ভাষা হল মনের ইশারা। ইন্দ্রিয়ের

দৃশ্যমান অংশ। ক্রোধ, অভিমান, অনুরাগ, বিরাগ, আবেগ, লোভ, লালসা, হিংসা, প্রেম। অবশেষে কোটরগত। চারপাশে মসিরেখা। নীল জমি ঘোলাটে লাল। মৃত কালোর চোখ। ভোরে পিচুটি। রাতে জল। উদাস, ফ্যালফ্যালে, হতাশ।

দেহ! শাড়ি জড়ানো খাঁজ খোঁজ। উঁচু নিচু। গড়ন পেটন। আমার চোখেই তার ব্যাখ্যা। নিতম্বের এক ভাষা। কুচযুগ। মরাল গ্রীব। বিম্ববতী। অধরোষ্ঠী। চরণারবিন্দ। সব আমার ব্যাখ্যা। শরীরের ব্যাখ্যা মাংসপিণ্ড। বাঁখারির কাঠামোর মতো হাড়ের খাঁচা। মাঝখানটা ফাঁপা। বাকিটা নিরেট। ফাঁপা অংশে প্যাক করা, একজোড়া ফুসফুস। ধুকপুকি হৃদয়। নাড়ি, ভুঁড়ি, পিত্ত, কফ। বায়ু উঠছে। বায়ু নামছে। উদরকমলে কবিতার বদলে, ভুটভাট শব্দ। চোয়া ঢেঁকুর। কোষ্ঠকাঠিন্য। আমাশয়। দেহ কারোর খবর, প্রেমের খবর রাখে না। দেহ রাখে রোগের খবর। গলব্লাডারে স্টোন। গাঁটে গাঁটে বাত। মরাল গ্রীবার দু পাশে দুই প্রহরী টনসিল। ওষ্ঠে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারা দাঁতে কালো পোকা। দন্তশূল। পায়োরিয়া। নাকে ইউক্যালিপটাস লাগিয়ে চুম্বন। অবশেষে, মেদভারে পৃথুলা অথবা রক্তাল্পতায় কৃশকায়। কুঞ্চিত ত্বক। ভেতরে রোগের ঘুণপোকা। প্রতি পদক্ষেপে আর্তনাদ। বাবা রে প্রেম রে! বাবা রে দেহ রে! মাই লাভ! গুষ্টির পিণ্ডি! যৌবনের দেহি-পদপল্লব শেষে পদ-পিলার। গ্রেট গদা।

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝে গেলুম। তৃপ্ত একটা প্রাণী নেমে এলুম নড়বড়ে ট্রাম থেকে। জগতের চেহারা নিমেষে পালটে গেল। এই পালটে যাওয়াটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। সেই তবলচি ব্যাটা আমার ভাব চটকে দিলে। এতক্ষণ যাকে বউ বউ বলছিলুম, তার নাম পার্বতী। পার্বতীর জন্মদিন। তবলাবাবু একতোড়া রিয়েল গোলাপ নিয়ে ঢুকছে। লাল টুকটুকে। সেই গোলাপ, যাতে গন্ধ আছে। ভ্রমর বসে। ছেলেটা দিয়ে দিয়ে মেয়েটির লোভ বাড়িয়ে দিলে। ফুল, চকোলেট, সিল্কের শাড়ি। একদিন দেখি দু' হাতে দুটো আইসক্রিম নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। যেন মশাল হাতে অলিম্পিক দৌড়বীর। পার্বতীকে আইসক্রিম খাওয়াবে। পারেও বটে। আসলে ও পার্বতীর অনেক কাছে আছে। ওরই বোলে পার্বতীর পা নাচে। পয়সা হলে মানুষের অনেক আদিখ্যেতা হয়। দামড়ি মেয়ের জন্মদিন। আধবুড়ির বিবাহবার্ষিকী। পার্বতীর বাবা হল কন্ট্রাকটার। পয়সার মা-বাপ নেই। মুখে সব সময় দু'খিলি পান ঠোসা। অও, অও, করে সকলকে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন। গুরুপূর্ণিমার দিন বাড়িতে বিশাল ব্যাপার। ইয়া ব্যারেলের মতো মোটা এক গুরু আসেন, যাঁর মুখে এত মাংস যে চোখ দেখা যায় না।

গলাটা নেই। কাঁধের পরেই মুণ্ডু। আমি একবার কাছ থেকে দেখেছি তাঁকে। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ছোট ছোট মিছরির দানা মুখে ফেলছেন আর ঘরভর্তি ভক্তদের একটা কথাই বলছেন, 'ব্যাটা, যম যখন পেছন দিক থেকে এসে ক্যাঁক করে গলা টিপে ধরবে, তখন তোর পাশে কে থাকবে রে হারামজাদা।' সে প্রায় ধমকাতে লাগলেন, 'বল, কে থাকবে! হারামজাদার দল। বল কে থাকবে।' বিছানা ছেড়ে তেড়ে তেড়ে উঠছেন, 'বল হারামজাদা কে থাকবে! বউ, ছেলে, ছেলের বউ, নাত বউ। কে থাকবে?'

গুরুদেবকে ওই রকম করতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। মখমলের বিছানা থেকে নেমে এসে যদি ওই পিলারের মতো পায়ে একটা লাথি হাঁকড়ান, নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেছিলুম, 'তিনি থাকবেন।'

বলা মাত্রই সে কী কাণ্ড। গুরুদেবের শরীর শিথিল হয়ে গেল। হাতের মুঠো থেকে রেশমের চাদরের ওপর সব মিছরির দানা হীরের টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়ল। যে দুটো জায়গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, দুটো জায়গাই মনে হয় চোখ। তাঁর স্বরও এলিয়ে গেছে। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, 'কোন্ হতভাগা তাঁর কথা বললে। কোন্ হতভাগা!'

খুব অন্যায় করে ফেলেছি ভেবে আমি কাটার তাল খুঁজছিলুম। আমার পাশে পার্বতীর মামা বসেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে শনাক্ত করে দিলেন, 'এই যে বাবা, এই হারামজাদা বলেছে।'

তখনই বুঝলুম এই গুরুর ধরনটাই এই রকম। আমরা সবাই হারামজাদা। গুরুভাইয়ের বদলে ওই। গুরুদেব অমনি সামনের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন, যেন দুটো পাইথন। দুটো ওপর বাহু থেকে থলথলে মাংস নেমেছে, যার ওজন দশ দশ কুড়ি কেজি তো হবেই।

হাত দুটো ওই ভাবে রেখে তিনি ডাইনে বামে দুলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'হারামজাদা, বুকে আয়। হারামজাদা আমার বুকে আয়।'

আমি বসে বসেই দরজার দিকে এগোচ্ছিলুম। চৌকাঠের কাছাকাছি গিয়ে উঠে দাঁড়াবো, দাঁড়িয়েই দে ছুট। সে আর হোল না। পার্বতীর দশাসই মামা বেড়াল ধরার মতো করে ধরে চৌকির দিকে ঠেলে দিলেন। সোজা তাঁর বুকে। দু'হাতে বুকে চেপে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। মনে হল আমি নরম তুলোর তোশকের ভেতর ঢুকে পড়েছি, আর সেই তোশকের ম্যালেরিয়া। কেঁপে জ্বর আসছে। সবাই বলতে লাগলেন, 'উদ্দীপন, উদ্দীপন।' হারমোনিয়াম বেজে

উঠল। সবাই গলা মিলিয়ে ধরলেন, 'ভবসাগর তারণ কারণ হে।'

কেউ কেউ আখর দিলেন, 'জয় প্রভু। জয় মন্মহাপ্রভু।'

গুরুদেব আমাকে জাপটে ধরে আছেন। সেই অবস্থায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'তিনি, ওরে, হাবামজাদারা, তিনি।'

এই হারামজাদার রহস্যটা পরে জেনেছিলুম। গুরুদেব ছিলেন, নালিকুল থানার দারোগা। ভয়ে সবাই কাঁপতো। অ্যায়, হারামজাদা বলে পেটে হাঁটুর গুঁতো। সে যত বড় অপরাধীই হোক, মাসখানেক শয্যাশায়ী। একদিন একটা গ্রামে ডাকাত ধরতে গেছেন। পোড়ো জমিদার বাড়িতে ডাকাতদের ঘাঁটি। দোতলার ঘরে বসে আছেন রিভলভার বাগিয়ে। গ্যাংকে গ্যাং, সব হারামজাদাকে শেষ করবেন। ভাঙা ঘর। ছাদের একটা অংশ ঝুলে পড়েছে। ধুলো। আবর্জনা। শুকনো পাতা। জানলা দবজা সব চোরে খুলে নিয়ে গেছে। একদিকের দেয়ালে শুধু একটা ছবি ঝুলছে। কাঁচও আছে। কি ব্যাপার। কিছুই নেই, শুধু একটা ছবি। রহস্যজনক। টর্চলাইট ফেললেন। পরিষ্কার ছবি। কাঁচটা যেন এইমাত্র কে মুছে গেছে। হাঁটু গেড়ে হাত দুটি তুলে বসে আছেন বালগোপাল। মুখে দুধের হাসিটি লেগে আছে।

আলো নেবালেন। অঘ্রান মাস। যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন, সামনে ধুধু ফাঁকা মাঠ। দূরে পথ। ঝোপঝাপ। জংলা জমি। অঘ্রানের হিম নামছে হিল হিল করে। চারপাশ ঝাপসা ভূতুড়ে।

দাবোগাসায়েব আবার টর্চলাইট ফেলেন। বালগোপাল হাসছেন। দুটি চোখে জীবন্ত স্নেহ। মনে হল ছবি ছেড়ে এখুনি নেমে আসবেন ভূমিতে। আলো নেবালেন। মনে মনে ভাবলেন, এরকম কেন হচ্ছে! বারেবারে দেখতে ইচ্ছে করছে। সামান্য একটা ছবি। ইনফর্মার খবর এনেছে, সনাতনেব দল আজ এখানে আসবে। দারোগাবাবু চারপাশে তাঁর বাহিনী ছড়িয়ে রেখেছেন, আড়ালে আবডালে। নিজে বসে আছেন দোতলায়। ঘরের লাগোয়া বারান্দাটা কবে ভেঙে পড়ে গেছে। দরজা চোরে নিয়ে গেছে। দরজার জায়গায় হাহা করে হাসছে শূন্যতা। শিশির-ঝাপসা কালো আকাশের পর্দা ঝুলছে।

হঠাৎ দেখলেন, বহু দূর থেকে একটা আলো আসছে। প্রথমে বিন্দু, ক্রমশ বড় হচ্ছে। রিভলভার। অন্ধকার দেয়ালের দিকে সরে গেলেন। ঠোঁটে বাঁশি। ফুঁ মারলেই ছুটে আসবে দশজন সশস্ত্র পুলিস। একটু অবাক হলেন, আলোটা আসার ধরন দেখে। এয়ারোপ্লেনের মতো ভেসে ভেসে আসছে যেন। আলোটা তো মাঠের ওপর দিয়ে আসছে না। আসছে গাছের মাথার ওপর দিয়ে। চোখ

ঝলসানো আলো নয়। স্নিগ্ধ, নীলচে একটা জ্যোতি। এই ধরনের আলো তিনি আগে কখনো, কোথাও দেখেননি। দারোগার দারোগা হরিপদ ভটচায তাঁরও বুক কেঁপে গেল। নীল আলোটা ভাসতে ভাসতে ঘরে এসে ঢুকলো, এই অবধি তিনি চর্মচক্ষে সজ্ঞানে দেখেছিলেন। বাকিটা অচেতন অনুভূতি। এক সাধিকা এসে বসলেন। সারাটা রাত তাঁর খেলা চলল ওই গোপালের সঙ্গে। গোপাল হামা দিয়ে দারোগা হরিপদ-র পাশ দিয়ে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ছুটছে। খিল খিল হাসছে। দারোগার গালে দুধের হাতে চাঁটা মারছে। চুল ধরে টানছে। সাধিকা মাঝে মাঝে কোলে তুলে নিচ্ছেন গোপালকে। সাধিকা দীর্ঘদেহী। সাদা কাপড়। হাতে একটি দণ্ড আর কমণ্ডলু। সর্বাঙ্গ দিয়ে নীল একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে। সব শেষে সাধিকা যাবার আগে হরিপদ-র মাথায় হাত বুলিয়ে বলে গেলেন, তোমার এত দাপট। জীবনটা নষ্ট কোরো না। কানের আরও কাছে মুখ এনে বললেন, 'লীলা, লীলা, অখণ্ড লীলা।'

ভোর হল, ধূলিশয্যা ছেড়ে যিনি উঠলেন, তিনি আর গুঁতো মারা দারোগা নন। প্রেমিক এক মানুষ। তাঁর ঠোঁটের কোণ বেয়ে পড়ছে দুধের ধারা। তাঁর কোমরে প্যান্ট থাকছে না, হাতে রিভলভার থাকছে না। চোখে জলের ধারা। ধরতে এসেছিলেন সনাতনকে। নিজেই ধরা পড়ে গেলেন। দশজন হাবিলদার একটা গরুর গাড়িতে ফেলে দারোগাসায়েবকে নিয়ে গেলেন থানায়। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। দারোগা হরিপদ থানার টেবিলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। কাঁদছেন, আর গোপাল গোপাল বলছেন। নালিকুলের সেই জমিদারবাড়ি এখন বিশাল এক আশ্রম। শত শত ভক্ত শিষ্য সারাদিন সঙ্কীর্তন করছেন। কুখ্যাত সনাতন এখন সাধু সনাতন। আশ্রমের ম্যানেজার। প্রেস পাবলিকেশান সামলায়। বিদেশী ভক্তদের সেবা করে। আশ্রমের সামনে সদাসর্বদা, দশ বিশটা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। প্রভুপাদ মুখ তুলে তাকালে ভাগ্যও মুখ তুলে তাকায়।

প্রভুপাদের গোলাপ আর চন্দনগন্ধী বুকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা। অজগর বন্ধন। তিনি সমাধিস্থ। ঘরে চাপা সুরে সমবেত সংগীত, হরি ওঁ, হরি ওঁ। আমার মনে হল, নিজের জ্ঞান দিয়ে এঁর বিচার না করাই ভালো। আবেশটি মিথ্যা নয় সত্য। কারণ শরীরের সব ফাংসান বন্ধ। এবং অনেকক্ষণ। আমার জ্ঞান কতটুকু। সেই জ্ঞান দিয়ে বিচার চলে না। আমি লিঙ্গেশ্বর। আমার পৃথিবী হল, আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।

হঠাৎ প্রভুপাদের বন্ধন শিথিল হল। আমি মুক্তি পেলুম। সত্য বলতে কি,

আমারও ঘোর লেগে গেছে। প্রভুপাদ স্বর্গীয় কণ্ঠে গাইতে লাগলেন, কেন বঞ্চিত হব চরণে/কত আশা করে বসে আছি পাবো/জীবনে না হয় মরণে ॥

এত সুর। এত ভাব। ঘরের প্রতিটি মানুষের চোখে জল। আমি কোনও দিন কোনও আবেগ অনুভব করি না। আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করছে। প্রভুপাদ মরকতমণির মতো চোখ মেলে আমাকে বললেন গা। হয়ে পথেরই ধূলায় অন্ধ/এসে কি দেখিব খেয়া বন্ধ ॥ আমারও গলা খুলে গেছে। সুরে সুর বেশ ভালোই লাগছে। এত ভালো লাগছে যে কাঁচের জানালা আলমারি সব চিনচিন করে উঠছে এক এক সময়।

সেই দিন থেকে আমি পার্বতীদের বাড়িতে হিরো। গুরুদেব যাকে বুকে টেনে নেন। পার্বতীর বাবা ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের পান ফেলে দেন। বেশ সমীহ করে কথা বলেন। মাঝে মাঝে পরামর্শ চান। পার্বতীর জন্মদিন। যত রাজ্যের কাউনসিলার আর কমিশনারকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ব্যবসার সুবিধে হবে। লাল গোলাপ নিয়ে তরলাবাবু সেজেগুজে ঢুকছেন। আর কিছুদিন আগে হলে আমিও ঘড়ি বাঁধা দিয়ে পদ্ম কিনে আনতুম। আমি এখন একটু থমকে গেছি। আমার সামনে তিন চারটে পথ খুলে গেছে। কৃষ্ণসখা পার্থসারথি। জ্ঞান আর কর্মযোগ। লেগে থাকলে বিলেত পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রভুপাদ হরিপদ। নালিকুল আশ্রমে প্রেস আর পাবলিকেশান ইনচার্জ করে দিতে পারেন। সেই রকম আভাস দিয়ে গেছেন। ওস্তাদ বিষ্ণুকুমার শিল্পী করে দেবেন। বড়লোক নন্দা। সে আবার নিজেই তেলের ব্যবসা চালায়। বাবার পার্কিনসনস ডিজিজ। সবে ধরেছে। হাতপা থরথর করে কাঁপে। নন্দার মা এত বড় ঘরের মেয়ে যে কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারেন না। সব সময় গোবদা মুখো।

সকালে পার্বতীরা নালিকুলে গিয়েছিল প্রভুপাদের আশীর্বাদ আনতে। প্রভুপাদ আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। পরে পড়ে দেখবো। পার্বতী বেশ সেজেছে। নাচের ফিগার। পার্বতীর মুখ আর চোখ অতুলনীয়। দেখলেই একটা তৃপ্তি হয়। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আমি ইচ্ছে করেই শুধু হাতে এসেছি। কিছুই আনিনি। বেকার ছেলে। তাছাড়া হঠাৎ আমার মনে হয়েছে, প্রেম একধরনের ন্যাকামি। প্রেম বলে কিছু নেই। আসল ব্যাপার হল অধিকারবোধ আর ইন্দ্রিয়। আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার বউ। আমার রাত, আমার বিছানা, আমার ইচ্ছা। সাধারণের পৃথিবী মোটা গ্যাদগেদে। মাছের বাজারের মতো ভ্যাটভেটে।

তবলাবাবু খুব কেতা করে সিনেমার নায়কের কায়দায় গোলাপগুচ্ছ পার্বতীর হাতে তুলে দিল। বড়লোক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের ভিড়ে পার্বতী খুব একটা গ্রাহ্য করল বলে মনে হল না। তবলাবাবুকে এখন আমি আর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনেই করি না। একপাশে বসে সে চেয়ারের হাতলে তাল সাধছে। সেধে যাও। তুমি ভেবেছো জীবনটা হিন্দী সিনেমা। না বাছা। পার্বতী কোনও দিনই মেরা মহব্বত বলে তোমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করবে না। পৃথিবীটা জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। চারস্তম্ভে ছাদ ঝুলছে। অনন্ত জীবন লীলা চলছে।

হঠাৎ পার্বতী একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। সবার অলক্ষ্যে আমাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, 'চুপ করে দাঁড়ান।' অন্ধকার ঝুল বারান্দা। নীলকালো আকাশে প্যাটপ্যাট করে তারা জ্বলছে। বেশ একটা ভিজে ভিজে বাতাস দিচ্ছে। অন্ধকারে পার্বতী। পার্বতী নামটার মধ্যেই হিমালয়ের গন্ধ। ধর্মের ছোঁয়া। পার্বতী লাল রঙ ভালবাসে। লাল শাড়ি। তার ওপর সোনালি রঙের কাজ। বড় চুল। বিশাল খোঁপা। খোঁপায় জুঁই ফুলের গোড়ের মালা। গন্ধ থমকে আছে। বেশ বুঝতে পারছি মনের ভেতর একটা কিছু হচ্ছে। সেই হওয়ার মধ্যে আবেশ আছে, আবেগ আছে, অহঙ্কার আছে, অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে, ধর্ম আছে।

পার্বতী গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। ব্যাপারটা কি হোলো। তাড়াতাড়ি হাত ধরে ওঠালুম।

'ব্যাপারটা কী হোলো?'

'আজ আমার জন্মদিন।'

'জানি। সুখী হও। দীর্ঘজীবী হও। আমাকে প্রণাম? তুমি তো অহঙ্কারী!'

'কে বলেছে?'

'আমার মনে হয়েছে।'

'আপনার ভুল ধারণা। আমি খেয়ালী। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'ভালোবাস না?'

'জানি না।'

আমাকে থমকে দিয়ে পার্বতী চলে গেল। প্রভুপাদের কৃপা। আমাকে বলেছিলেন, সব মানুষের ভেতরেই একটা করে হুলো থাকে। ম্যাও ম্যাও করলে দূর দূরই জোটে। হুলো বিদায় করো। হুলোটাকে মনে হয় মন থেকে তাড়াতে পেরেছি। পার্বতী চলে যাবার পর আমি অন্ধকার ঝুল বারান্দায় বেশ কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে রইলুম। এতদিনে একটা কিছু পেলুম। রমণীর মন।

আমাদের একটা দল আছে। হাঘরে-দল। প্রশান্তদের রকে মাঝে মধ্যে সিটিং হয়। কারুব তিন বছব, কারুর চাব বছর। পাশটাশ করে বসে আছে। চাকরির পাত্তা নেই। ছিলুম দশজন। ছ'জনে ঠেকেছি! চারজনের একজন দুর্গাপুরে, একজন ভিলাইতে, একজন বোম্বাইতে, আর একজন বিলেতে ব্যবস্থা করে নিয়েছে। জানি, ওই চাবজন আর আমাদের খোঁজ রাখবে না। দেখা হলে উদাস গলায বলবে, 'কি রে কেমন আছিস!' তাবপর বিজ্ঞেব মতো বলবে, 'এখনও কিছু পেলি না না!' বেকার আর চাকুরের মধ্যে সাগরের ব্যবধান।

পাড়ায় ঢুকেই দেখি প্রশান্তদেব বাড়ির সামনে বিশাল জটলা। অনল বললে, 'কোথায থাকিস! পাগলের মতো খুঁজছি। শিগগির চল। প্রশান্তটা বিষ খেয়েছে।'

'সে কি রে! কাল সকালেব ট্রেনে বিলাসপুর যাবে তো।'

'আর বিলাসপুব, নিশ্চিন্তপুরেব যাত্রী এখন।'

অ্যাম্বুলেনস ঢুকছে। প্রশান্তকে ধরাধরি করে তোলা হল। ফর্সা মুখ কুচকুচে কালো হয়ে গেছে। ঠোঁটের দুপাশে গ্যাঁজলা। প্রশান্তটাকে সাযেব বাচ্চাব মতো দেখতে ছিল। যাব এত রূপ সে গেল আত্মহত্যা করতে। ব্যাটা গাধা।

তুই এমন মানবজনম আর পাবি? আমাদের মতো বন্ধু আর পাবি! এমন দেশ আর পাবি! দিবসে সূর্যালোক। নিশীথে নক্ষত্রখচিত আকাশে চন্দ্রকিরণ। মলয় বাতাস। কুহু কেকা। তটিনীর জলকল্লোল। বমণীর কটাক্ষবাণ। ব্যাটা গাধা।

'কি খেয়েছে রে?'

'কত কি আছে। বিষেব অভাব।'

'কেন খেয়েছে?'

'শোনা যাচ্ছে বমেনের বোনের সঙ্গে ইযে ছিল।'

'আমরা জানলুম না।'

'সে কথা পবে। আমরা কে কাব কতটুকু জানি। এই যে আমি তিনদিন মুড়ি আর জল খেয়ে আছি, তুই জানিস?'

'না।'

'তবে! রমেনেব বাবা আজ ওকে সন্ধেবেলা জুতোপেটা করেছে; আর রমেনের মা মেয়ের চুল আধ হাত মতো কেটে দিয়েছে।'

'রমেনের বোন ছাড়া পৃথিবীতে আর মেয়ে নেই। রাসকেল একটা মেয়ের

জন্যে মরতে গেল।'

'মেয়ের জন্যে নয়। মরতে গেছে জুতোর জন্যে। সব সহ্য করা যায়। যায় না অপমান, উপেক্ষা।'

অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে ঢুকলো। প্রশান্তটা চলে যাবে! একসঙ্গে পড়েছি। খেলেছি। বেড়িয়েছি। সিনেমা দেখেছি। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়েছি। বিয়েবাড়িতে দল বেঁধে খেতে গেছি। জীবন নিয়ে পরিকল্পনা করেছি। সেই প্রশান্ত চলে যাবে। চলেই যদি যাবি তাহলে এত পরিশ্রম করলি কেন? রাত জেগে পড়া। পরীক্ষা দেওয়া। এই তো সাতদিন আগে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এলো। চারটে হুমদো লোক দেড়ঘণ্টা ধরে ওকে নাড়াচাড়া, খাবলাখাবলি করেছিল। বলা যায় না চাকরিটা হয়েও যেতে পারে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত আর ভদ্রস্বভাবের প্রশান্ত ভীরুর মতো কাপুরুষের মতো চলে যাচ্ছে।

প্রশান্ত সত্যিই চলে গেল। আমরা ঠিক করলুম রমেনের বাবার বিরুদ্ধে কেস করবো। প্রশান্ত কোনও অভিযোগ রেখে যায়নি। তাছাড়া রমেন আমাদের প্রিয় বন্ধু।

'প্রশান্তর সঙ্গে নেলির বিয়ে দিলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হতো। তোর বাবা প্রশান্তর চেয়ে ভাল পাত্র পাবে?'

'আমাকে বলছিস কেন? যার মেয়ে তাকে বল। আমার বাবাকে তো চিনিস!'

'খুনী। মার্ডারার। ওরকম বনেদী আমরা অনেক দেখেছি। তোর বাবা কত বড় চাকরি করে রে? কত পয়সা?'

'আমাকে ঝাড়ছিস কেন? এসব হয়েছে মায়ের ওসকানিতে। নেলিকে একদম সহ্য করতে পারে না। সারাদিন মা মেয়েতে চুলোচুলি হচ্ছে। এক ব্যাটা ঘটক কোথা থেকে এক পাত্র এনেছে। পদ্মপুকুরের জমিদার। আর অপেক্ষা করা যাবে না। পারলে কালই বিয়ে দিয়ে দাও। আপদ বিদায় করো। মেয়ে এখন আপদ।'

'ও মেয়ে হল এঁড়ে আর তুই হলি বকনা। যে কোনও দিন দুধেল হয়ে উঠবি। তাই খাতির। শালা স্বার্থপরের সংসার। তুই একটা তেড়ে বিয়ে কর তো। এমন একটা বউ নিয়ে আয় যাতে বুড়ির জীবন হেল হয়ে যায়।'

চিতা জ্বলছে। প্রশান্ত পুড়ছে। আমরা বসে আছি চিতার মাথার দিকে। পাকুড়গাছের তলার বাঁধানো বেদীতে। প্রশান্তর মাথার তালুটা দেখতে পাচ্ছি। খাড়া নাক। কি চুল ছিল ছেলেটার। নিমেষে পড়পড় করে পুড়ে গেল। ধোঁয়া

আর আগুন লকলকিয়ে উঠছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে শায়িত শরীরটা দেখা যাচ্ছে। কালো পাথরের মূর্তির মতো। হু হু করে আগুন উঠছে। আগুনের কি আক্রোশ। কে একজন বললে, 'ছেলেটা খুব পুণ্যাত্মা ছিল। আগুনটা দেখেছিস! দেড়তলা পর্যন্ত উঠেছে। আরও উঠবে। দোতলা ছাড়িয়ে যাবে।'

অদ্ভুত সব হিন্দু বিশ্বাস। আগুন যত উঁচু হবে সে তত পুণ্যাত্মা। প্রশান্ত-র দাদা একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে। ভদ্রলোকের মনে হয় খুব আনন্দ। অংশীদার চলে গেল। বাড়িটা এখন একাই ভোগ করবে। রমেন বললে, 'প্রশান্তটা খুব খেতে ভালবাসতো। পরশু আমায় বলেছে এত বিয়ে হচ্ছে চারপাশে, কেউ মাইরি ভুলেও নিমন্ত্রণ করে না।'

'আমাকে বলেছিল চাঁদা তুলে জীবনে অন্তত একদিন পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় খাবে।'

'ছেলেটা খুব পরিষ্কার ছিল। অত অল্প জামা কাপড়; কিন্তু কেচেকুচে সব সময় ফিটফাট। শরীরটা সব সময় ঝকঝক করত। লক্ষ করেছিস চা খাবার পর ও হাত ধুয়ে আসত। ওর কতগুলো ছোটখাট ব্যাপার ছিল, ভারী সুন্দর।'

'ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল।'

'এমন কি মৃত্যুটাও।'

আমরা পাকুড়ের তলায় বসে আছি। শাখাপ্রশাখায় বাতাসের শব্দ। উজ্জ্বল তারাভরা আকাশ। প্রশান্ত যাচ্ছে। চিতায় দেহটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। শেষ রাতে একমুঠো ছাই। প্রশান্ত নেই। আর কোনও দিন আসবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের একবারই দেখা হয়। ভোর। আলো ফুটেছে পূর্বে। আমরা চাপা স্বরে হরি বোল, বলতে বলতে ফিরে এলুম। দশ থেকে ছয়। ছয় থেকে পাঁচ। জীবনে প্রথম মৃত্যুর ছোঁয়া। যাক ভয়টা কেটে গেল।

প্রভুপাদের চিঠিটা দুপুরের দিকে খুললুম। একটি প্রস্তাব। 'চলে এসো আশ্রমে। অনেক কাজ আছে করার মতো। কি হবে সংসার নামক বদ্ধকূপে পড়ে থেকে। জীবনকে একটা নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড় করাও। তুমি আমাদের প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব নাও। সনাতন ঠিক পারছে না। আমাদের সন্ন্যাস নেই; তবে সংযম আছে, সাধনা আছে। একেবারেই বুজরুকি নয়। জানবে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, লোকে যাকে মানে তার মধ্যে ঈশ্বরের স্ফুরণ আছে। আশ্রমে এলে দেখবে, শত শত মানুষ ছুটে আসছে একটু শান্তি পাবার আশায়। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। এখানে ভোগের অভাব নেই, কেবল নারী ছাড়া।'

সবে প্রাণের বন্ধুকে দাহ করে ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, রাজি আছি, কবে যেতে হবে জানান। এতদিনে মনের আশা পূর্ণ হল। আমার একবার মনে হয়েছিল, অনেক দিন তো হয়ে গেল, যুগাবতার রামকৃষ্ণের তো পুনরাবির্ভাবের সময় হয়েছে। কে বলতে পারে, আমিই হয়তো সেই দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ। মনে হল, তাঁর যা যা হত আমারও তাই হচ্ছে। বৈশাখের এক দ্বিপ্রহরে কালো মেঘের গায়ে বকের সারি দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। অটোমেটিক অজ্ঞান। হলুম না। ভাবলুম, বয়েসটা বেড়ে গেছে তো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভালো মূর্তি গড়তে পারতেন। একতাল মাটি নিয়ে একদিন বসলুম। শিব গড়তে বাঁদর হল। ব্যাখ্যা করলুম, মাটির দোষ। গঙ্গার মাটি বলেই হচ্ছে না। এঁটেল মাটি হলে হত। টাকা মাটি, মাটি টাকা বলেই, টাকা আর কষ্ট করে পকেটে আসছে না। হাতের আঙুল আর নখ ঠাকুরের ছবির সঙ্গে মেলালুম। প্রায় এক। বাদামের মতো নখের গড়ন। গোলাপী রঙ। সমাধির সময় আঙুলগুলো যেরকম হত, সেই রকম করে বেশ কিছুদিন রিহার্সাল দিলুম। সমাধি তো একদিন হবেই, তখন যেন অন্যরকম না হয়ে যায়।

যোগেনকে দলে ভেড়ালুম। চোখ দুটো বেশ বড় বড়। বেশ করে বোঝালুম, তুই বিবেকানন্দ। নিজেকে চিনতে পারছিস না। তোর গানের গলা আছে। ব্যায়াম করিস। ইতিহাস তোর প্রিয় সাবজেক্ট। যোগেন বললে, স্বামী বিবেকানন্দ হতে হলে, কত কষ্ট করতে হবে জানিস? সারা ভারত ঘুরতে হবে। আমেরিকায় যেতে হবে। প্যাকিং বাক্সে শীতের রাত কাটাতে হবে। তারপর আর একটা ধর্মসভা চাই, যেখানে আমি বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলব, ব্রাদার্স অ্যাণ্ড সিস্টার্স অফ আমেরিকা। আমি বললুম, দেখবি তোর জন্যে সব হবে। আমি যদি দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ হয়ে আবার নবজাগরণ আনতে পারি তাহলে তোকে আমি দ্বিতীয় বিবেকানন্দ করে ছাড়বোই।

যোগেন আবার একটা সমস্যা হাজির করলো, বয়সের তফাত। আমরা দু'জনেই সমবয়সী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামীজীর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। যোগেন বললে, 'তুই দেহ রাখবি, তারপর আমি যাবো কন্যাকুমারী। সেখানে তুই আমাকে আলোর শরীরে দর্শন দিবি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবি। সেই দেখে আমি আমেরিকা ছুটবো। তোর যা শরীর সহজে কি ক্যানসার হবে!'

আমি বললুম, 'সবই মা জগদম্বার ইচ্ছে।' আমার তখন কিছুটা এসে গেছে। আমি আর একটু যোগ করলুম, 'শালা, তুই আমেরিকাটাই দেখলি, স্বামীজীর

অন্য কাজ দেখলি না ! তিনি বলেছিলেন দবিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, মূর্খ ভাবতবাসী আমার ভাই। সেই ভাইদের জন্যে তুই নিজেকে বলি দিবি। তা না শুরু থেকেই আমেবিকা, আমেরিকা। আমেবিকায় কি আছে রে ?'

'চাকরি আছে মাইরি। ডলার।'

'স্বামীজী মাইরি বলতেন না।'

'তুই যে শালা বললি !'

'ঠাকুর শালা বলতেন।'

'অ তাঁব শালাটা নিলি ?'

'শালাব মধ্যে বেশ একটা উদ্দীপন আছে।'

'সে কি ওই শালার বোনেব জন্যে ?'

'এটা কি স্বামীজীর মতো কথা হল ? কদর্য ইঙ্গিত।'

'আহা ! আমি তো এখনও স্বামীজী হইনি।'

যোগেনকে নিয়ে প্রায়ই আমি দক্ষিণেশ্বরের বেলতলায়, যেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল সেইখানে যেতে লাগলুম। আণ্ডাবস্ট্যাণ্ডিং ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্সের চেয়ে ঢের ভালো মনে হল। টাকা মাটি। মাটি টাকা। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ। দুটো থার্ড ক্লাস জিনিস। মা ভবতারিণী আছেন। তাঁকে নামাতে হবে। পথ ? ঠাকুরের নির্দেশিত সাধন পদ্ধতি। কিচ্ছু না, স্রেফ ব্যাকুলতা চাই। মা, দেখা দাও। তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছো, রামকৃষ্ণকে দিয়েছো। আমাকে দাও। দিয়ে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ করে দাও। কোনও রিলায়েবল সোর্স আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করছে না। সব সোর্সের মাথার ওপর যদি মাকে ধরে একবার বসতে পারি সব ব্যাটা আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। আমি ভাগবতী হাসি হেসে বলবো, কি গো জজসায়েব, কি গো ম্যাজিস্টার, কি গো রিটায়ার্ড আই সি এস,কি গো আই এ এস। কামিনী কাঞ্চনের কীট সব ! হ্যাট ম্যাট গ্যাট। হৃদে, দ্যাখ দ্যাখ কেমন মেয়েদের দিকে আড়ে আড়ে চাইছে। শালা বিয়ে করেছে তো ! শকুন যত ওপরেই উঠুক দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।

ঠাকুরের মতো মাটিতে মুখ ঘষি আর বলি, মা, দেখা দে। মা দেখা দে। মিনিট পনেরো পরেই ক্লান্তি এসে যায়। বড় কঠিন পথ। দেড়শো বছর ধরে যিনি দেখা দেননি তাঁকে নামাতে হবে। তিনি চোখ খুলবেন। কব্জায় জং ধরে। চোখের পাতায় ধরবে না। দেড়শো বছর মুদে আছে। খাটতে হবে। সাধতে হবে। একজন ভৈরবী চাই। ভৈরবীর কথাটাই আগে মনে এল ! সবার আগে একজন রানী রাসমণি চাই, আর চাই মথুরবাবু।

যোগেন বললে, 'কেন মিছিমিছি খেটে মরছিস ! নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস। ও হবে না। হয় না। একবারই হয়েছিল। তার চেয়ে চল আজ সন্ধেবেলা মীনাকুমারীকে দেখে আসি।'

'ছিঃ বিবেকানন্দ ! তোমার মুখে এই কথা ! তুই কত বড় হবি ! বটবৃক্ষের মতো হবি। তোর আশ্রয়ে কত ক্লান্ত পথিক এসে বসবে ! তুই শিবজ্ঞানে জীবসেবা করবি। সব ছেড়ে মীনাকুমারী ! ধিক বিবেকানন্দ। ধিক। ধিক। ধিক।'

বলতে বলতে আমার একটা ভাবসমাধি মতো হলো। ওরই মধ্যে পেছন ফিরে একবার দেখে নিলুম পেছনের দেয়ালে আলোর মতো একটা কিছু পড়েছে কি না ! মনে হয় জ্যোতি-ট্যোতি বেরোয় ধরতে পাবি না। তেমন কিছু বুঝলুম না। নিজের জ্যোতি নিজে বোঝা যায় না। কেউ দেখতে পেলেও হিংসেতে বলে না। যোগেনকে ধরে নিয়ে গেলুম দক্ষিণেশ্বরে। সোজা বেলতলায়। দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি ধ্যানে। ভীষণ মশা। হঠাৎ যোগেন এত জোরে বাপ বলে চিৎকার করে উঠল, চমকে চোখ মেলে তাকালুম। ভীষণ বিরক্ত হয়েছি। আমাকেও কামড়াচ্ছিল। কই আমি তো অমন চিৎকার ছাড়িনি। ইতিহাস জানে না। জানা থাকলে অমন করে চিৎকার করত না। আমি বেশ কড়া গলায় বললুম, 'যোগেন স্বামীজী যখন পঞ্চবটীতে ধ্যানস্থ হতেন গভীর রাতে, তখন তাঁর আদুড় পিঠ মশায় কালো হয়ে যেত। অন্যেরা সব ধ্যান ছেড়ে উঠে পালাত। ঠাকুর তাদের ধরে এনে দেখাতেন, দ্যাখ ধ্যান কাকে বলে।'

'আমি ভাই ম্যালেরিয়ায় মরতে চাই না।'

'ওরে মায়ের দর্শন পাবি। জ্যোতির্ময় হবি। কুলকুণ্ডলিনী চড়াক করে জেগে উঠবে। দেখবি সব ঈশ্বর।'

'তাতে আমার লাভ ?'

'তোর দেহবোধ চলে যাবে। সুখ দুঃখের বোধ থাকবে না।'

'বাঃ, দেহবোধ চলে গেলে, আমি ভোগ করবো কি দিয়ে ! আমি কিসের ধ্যান করছিলুম বল তো। মা কালী ঠিক তিন চার সেকেন্ড ছিলেন। তারপর কি এল বল তো ! ধর্মতলাব এক রেস্তোরাঁর শো-কেসে মুর্গমসল্লম সাজানো থাকে। বেশ বড় সাইজের একটা মুর্গমসল্লম একবারে ভুরুর মাঝখানে ধকধক করছে। হুটহাট করে যাও বা সেটাকে তাড়ালুম, ধিতিং ধিতিং করে নাচতে লাগল মধুবালা। তুই বল মাইরি এইরকম ডিসটারবেন্স হলে ধ্যান হয় ! দেড়শো বছর, কি একশো বছর আগের পৃথিবী আর আছে। তখন মুর্গমসল্লম ছিল না।

গীতাবলী, মধুবালা, মীনাকুমারী ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ হবার মতো পরিবেশ চাই। নোনা জমিতে ধান চাষ হয়! খোকা ব্যর্থ চেষ্টা করিসনি। ও-সব জন্মই আলাদা। অবতার পুরুষ। স্বামীজী ছিলেন সপ্তঋষির এক ঋষি।'

'জন্ম আলাদা মানে?'

'আলাদা মানে, তুই জন্মাবার আগে তোর মায়ের ভেতরে কি কোনও আলো ঢুকেছিল! মন্দির থেকে একটা আলোর বল বেরিয়ে এসে ভাসতে ভাসতে ঢুকে পড়ল পেটে। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, শিব কি বিষ্ণু বলছেন, এলুম গো তোমার ছেলে হয়ে।'

'শুনিনি।'

'তাহলে আর কেন বেলতলায় বসে বসে বৃথা মশার কামড় খাচ্ছিস! আমার মা-ও কোনও স্বপ্ন দেখেনি। তাছাড়া তোর হাতও বেঁটে বেঁটে। আমার হাতও বেঁটে বেঁটে। অবতার পুরুষদের হাত হয় আজানুলম্বিত। তুই ধ্যানে কি দেখছিলিস? সত্যি বলবি। বানাবি না।'

'ঘোর অন্ধকার।'

'নে উঠে পড়। গরম সিঙ্গাড়া আর জিলিপি খেয়ে বাড়ি চল। আমাদের লাইন আলাদা। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ি চল। ইন্টারভিউ দিতে হবে।'

জিলিপি খেতে খেতে মনে হল ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে যেন অনেক ভালো। সে কথাটা যোগেনকে আর বললুম না। তখনও আমার সন্দেহ যায়নি। আমি কি সাধারণ স্তরের? আমার ভেতর কিছু একটা আছে। দেরিতে তেড়ে-ফুঁড়ে বেরোবে। তখন একটা কাণ্ড হবে। নব-জাগরণ।

এখন দেখছি ফলছে! জহুরী জহর চেনে। পার্থসারথি ট্রাম থেকে টেনে নামালেন। প্রভুপাদ জড়িয়ে ধরলেন বুকে। পার্বতীর মতো গুমোরে মেয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে। তার মানে জাগছে। ডিম ফুটে মহাপুরুষ বেরোচ্ছে। প্রভুপাদের আশ্রমে গিয়ে বসি একবার, তারপর শুরু হবে আমার লীলা। ভক্তকুল ভেঙে পড়বে। নতুন কিছু তো আর বলার নেই। গোটা চারেক কথা, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, সোহম, সকলই তোমারই ইচ্ছা আর ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।

পরের দিন আর একটা চিঠি এল। বুলার অ্যান্ড কোম্পানিতে ইন্টারভিউ। সেই কবে অ্যাপ্লাই করেছিলুম! মনেও নেই। এখন আমি বেপরোয়া। প্রশান্ত-র মৃত্যুর পর বড় বড় মানুষের ওপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। এ দেশে লেখা-পড়ারও কোনও দাম নেই। সব ফার্স। মাতুলের ব্যাকিং থাকলে পঙ্গুও

গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।

ইন্টারভিউ দিতে গেলুম। বুলার অ্যান্ড কোম্পানি এখন ভারতের দ্বিতীয় বিশাল। শিল্প-অর্থনীতির আধখানা গিলে বসে আছে। বিশতলা বাড়ি বাঙালীকে দাস হবার জন্যে ডাকছে। চলে আয় শিক্ষিত বাঙালী, কুচুটে বাঙালী, স্বার্থপর বাঙালী, দেউলে বাঙালী, নাকতোলা বাঙালী, অহংসর্বস্ব বাঙালী, সব জানতা বাঙালী, ইংরেজের অপকর্মের ডান হাত বাঙালী। পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি বেচা বাঙালী। মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ বাঙালী। বিশেষণের আর শেষ নেই।

সাত তলায় ইন্টারভিউ-বোর্ড বসেছে। ঝকঝকে বাতানুকূল অফিস। কেতা দেখলে পিলে চমকে যায়। ওয়েটিং রুমে সব চাকুরিপ্রার্থী জুজুবুড়োর মতো বসে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সোনার চাঁদ ছেলে। এক একটাকে ডাকবে আর গোটা চারেক বাঘা লোক থাবা মেরে মেরে একবার এদিকে ওল্টাবে, একবার ওদিকে। এ বেশ ভালো খেলা। নগেনবাবুর রোজ সকালে কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানো। ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কুকুরের নাগালের বাইরে। কুকুর লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। প্রায় ধরে ফেলে, ধরতে পারে না। শেষে খপ্। নগেনবাবুর চিৎকার, ব্র্যাভো! ব্র্যাভো।

এক কাপ করে কফি দিয়ে গেল। খাও, বলির পাঁঠারা খাও। প্রথম ডাক পড়ল আমার। অবাক। এ যাবত যে কটা ইন্টারভিউ দিয়েছি, সব কটাতেই আমি ছিলুম শেষের নাম। তখন প্রশ্ন করলেও হয়, না করলেও হয়। ওদেরই একজন কেরানী চিবিয়ে চিবিয়ে ডাকলে, মিস্টার শোভনকুমার। আমি বেপরোয়া। যা হবার হবে।

পেল্লায় ঘর। পেল্লায় টেবিল। পেল্লায় পেল্লায় চারজন নির্বাচক। আমি যেন পার্কে মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছি, রিটায়ার্ড আই সি এস। সেইভাবেই কার্পেট মাড়িয়ে, কারুর বসতে বলার অপেক্ষা না করে, সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললুম, 'গুডমর্নিং জেন্টলমেন। দিস ইজ শোভনকুমার। আস্ক মি কোয়েশ্চেনস ওয়ান বাই ওয়ান অর সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাজ ইউ প্লিজ।' গোমড়ামুখো চার ভদ্রলোক ভড়কে গেলেন। আমার অ্যাপ্লিকেশান আর বায়োডাটার চারটে কপি চারজনের সামনে। সেই দিকেই চার জোড়া চোখ। মাঝের ভদ্রলোক মনে হয় চেয়ারম্যান অফ দি বোর্ড। তিনি ডান দিকের ভদ্রলোককে বললেন, 'দেন ইউ স্টার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিবাদ, 'নো, হি কান্ট স্টার্ট। ইট উইল অলওয়েজ গো ফ্রম লেফ্‌ট টু দি রাইট। ক্লকওয়াইজ ডিরেকসান। নট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ।

ইউ কান্ট গো এগেনস্ট দি ইন্টারন্যাশন্যাল ল, ফ্রেমড ইন দি লাস্ট হেগ কনভেনশান।'

'হেগ কনভেনশান?' চেয়াবম্যানের চোখ কপালে উঠল।

'ইয়েস। কনসাল্ট ইন্টাবন্যাশন্যাল ম্যানুয়েল অন রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড রিজেকসান, পাবলিশড বাই আই এল ও ব্রাসেলস।'

চারজনে চারজনের মুখের দিকে তাকালেন। চেয়ারম্যান ইতস্তত করে বললেন, 'দেন ফ্রম দি লেফট। মিস্টার খাণ্ডেলওয়াল বিগিন।'

'নো, হি কান্ট। কনভেনসান সেজ ইন করোলারি ফাইভ, চ্যাপ্টার ওয়ান পার্টওযান, দ্যাট বোর্ড-মেম্বারস ফার্স্ট ইনট্রোডিউস দেমসেলভ্স টু দি ক্যান্ডিডেট। ইউ আর ইয়েট টু ডু দ্যাট। আই অ্যাম সরি।' আমি চেয়ারে এলিয়ে বসে আছি। মনে মনে হাসছি। অফেনস ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স। আমার ভয় কি! এটা আমার চতুর্দশতম হ্যারাসমেন্ট। বাঙালী মেয়ের বিয়ে আর বাঙালী ছেলের চাকরি, দুটোই সমান যন্ত্রণা।

চেয়ারম্যান বললেন, 'আই অ্যাম ডক্টর বাটালিওয়ালা।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ। হোয়াট স্ট্রিম?'

'স্ট্রিম?'

'ইয়েস লাইন অফ এডুকেশন?'

'ইকনমিকস।'

'নেভার হার্ড ইওর নেম, হাওযেভার। নেকস্ট।'

মিস্টাব খাণ্ডেলওয়াল। মিস্টার দযারাম। মিস্টার ভজনলাল। আমি একটা ছোট্ট মন্তব্য করে হাসলুম, 'এ নন টেকনিক্যাল বোর্ড। মোস্ট অ্যামেচারিশ।'

চাবজনে হাঁ হয়ে গেছেন। ইন্টারভিউ দিতে এসে কেউ এইরকম করে না। আমি তো ডেসপ্যারেট। এর আগে যে তেবটা দিয়েছি, তাতে কোথাও জানাশোনা লোক আগেই ঠিক করা ছিল, কোথাও ডিপার্টমেন্টাল ক্যাণ্ডিডেটকে রেগুলারাইজেশান। ইন্টারভিউ, আইন রক্ষা। একটা তামাশা। আমি কুস্তির পালোয়ানের মতো বললুম, 'নাও, কাম অন উইথ ইওর কোশ্চেনস।'

প্রথম প্রশ্ন এল, 'হোযাট ইজ ফিলঅজফি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'প্যাসটাইম অফ আইডলারস!'

'বাস।'

'বাস্। কাম নেকস্ট।'

চারজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। প্রশ্ন এল, 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রি?'

'রেকর্ডিং দি প্যাসেজ অফ টাইম।'
'বাস্।'
'বাস্। কাম নেকস্ট।'
'হোয়াট ইজ ইকনমিকস?'
'কভার অফ দি ব্ল্যাকমানি।'
'বাস্।'
'বাস্। কাম নেকস্ট।'
'হোয়াট ইজ পলিটিকস?'
'লিগ্যালাইজেশান অফ মাসল পাওয়ার।'
'বাস্!'
'বাস, কাম নেকস্ট।'
'হোয়াট ইজ ল?'
'লুপহোলস ফর এস্কেপ।'
'বাস।'
'বাস। কাম নেকস্ট।'
'হোয়াই ইউ হ্যাভ কাম?'
'টু সি ইউ।'
'বাস্।'
'বাস। কাম নেকস্ট।'
'নাথিং।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আই হ্যাভ অ্যানাদার ইন্টারভিউ। বাই দি বাই, হ্যাভ ইউ রেড এ বুক, ইকনমিকস অফ বড়াবাজার, রিটন বাই কেজরিওয়াল অ্যাণ্ড ঝুনঝুনওয়াল, পাবলিশড ফ্রম চুনাপুঁটি লেন।'

'নো।'

'দেন ইউ আর নট অ্যান ইকনমিস্ট। থ্যাঙ্ক ইউ জেন্টলমেন।'

বেরিয়ে এলুম সোজা রাস্তায়। ভবিষ্যৎ না থাকলে মানুষের কি আনন্দ! স্বাধীন ভারতে মানুষের সেই আনন্দটা আছে। কোনও ভবিষ্যৎ নেই! আজ গড়িয়ে কাল। কাল গড়িয়ে পরশু। মরতে পারছি না বলে বেঁচে থাকা। আমরা এমন এক গরু যাদের কেউ চরাবে না। চরে খেতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনাটা কি? পরিকল্পনা তৈরি করা। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা বছরের পর বছর ধরে তৈরি করে যাও। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আমার একটা কার্ড আছে। আমি

বছরের পর বছর রিনিউ করিয়ে যাই। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে আমার দুটি সম্পত্তি। একটি এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জের কার্ড, আর একটি রেশন কার্ড।

এদিক ওদিক ঘুরে বিষ্ণুকুমারের ওখানে গেলুম। সবই তামাশা। গানও তাই। গান কে শোনে! শিল্পীর কোনও কদর আছে! সারা জীবন ছাত্র ঠ্যাঙাও। এ তানা যোবানা, পরমানানা, সারেগাপাধাসা, ধাপাগারেসা। গান আজকাল বিকোয় না। বিকোয় শব্দ। সে জিনিস শিখে করা যায় না। স্বাভাবিক প্রতিভা। বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি কেউ শেখাতে পারে! কেউ শেখাতে পারে হনুমানের হুপহাপ। হুলোর ঝগড়া?

সেদিন পথে ফেলে রেখে চলে যাবার অভিমান তখনও রয়েছে মনে। তবে আবার এও ভেবেছি, এ জগতে অভিমান চলে না। এ হল কাজ গুছিয়ে নেবার জগৎ। প্রবল শয়তান না হলে শুকিয়ে মরতে হবে। তক্তপোশে নীল লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ঘর আলো করে বসে আছেন বিষ্ণুকুমার। গা ঘেঁষে বসে আছে নন্দা। এপাশে ওপাশে আরও কয়েকজন।

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'আরে, সেদিন তুমি আমাদের ফেলে কোথায় চলে গেলে?'

'আমি চলে যাবো কেন? আপনারাই তো চলে গেলেন।'

'ওই দ্যাখো, বলে কি? আমি বলছি, তুমি তো নেমে গেলে?'

'সে তো ডানপাশের গাড়ি থামাবার জন্যে।'

'আমি বলছি, তুমি নামলে, বেশ নামো। তা তোমার উঠতে কি হয়েছিল?'

'গাড়ি তো চলে গেল।'

'কেষ্টবাবুর গাড়ি তো চলে না হাঁটে। আমরা এয়ারপোর্টে গিয়ে আবিষ্কার করলুম তুমি নেই।' বিষ্ণুকুমার গান ধরলেন, 'তারা দিলে না, দিলে না দিন, তারা দিলে না, দিলে না দিন।'

কি সুরেলা গলা, আর তেমনি গাইবার ভঙ্গি। রাগ অভিমান উড়ে চলে গেল। হঠাৎ নন্দার ইচ্ছে হল জর্দা দিয়ে পান খাবার। আমার বরাত খেলতে শুরু করল। নন্দা তার সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি সিকি বের করল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'একটা পান এনে দেবেন ভাই।'

ঘরে আরও অনেকে রয়েছে, পান আনতে হবে আমাকে। আমি কি লেডিজম্যান? পান নিয়ে এলুম। নন্দা পানটা নিতে নিতে বললে, 'কিছু ফিরেছে?'

'না তো।'

'বেশি নিয়েছে।'

অ্যায়। এই গোলো আমার বরাতের আর এক দিক। আমি সত্যি বললে লোকে ভাববে মিথ্যে বলছি। বাজার করতে গেলে সন্দেহ করবে পয়সা মেরেছি। বিনয় দেখালে ভাববে কিছু চাইতে এসেছি। সকলের তালিম হয়ে যাবার পর বিষ্ণুকুমার বললেন, 'নাও ছায়ানটের একটা লাইন নাও।'

নন্দা উল বুনছে আর গুনগুন গাইছে। মেয়েদের উল বোনার জায়গা নেই। সময় নেই। সিগারেটের নেশার মতো। ছায়ানটের ধরতাইটা ভারী সুন্দর। বাগটার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। গানের বাণীও বেশ সুন্দর, নেওয়ারকি ঝনকার। গান যখন বেশ জমে উঠেছে, নন্দার উলের গোলাটি তক্তপোশ আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে তলায় পড়ে গেল। নেওয়ারকি ঝনকারের ঝনকার শব্দটার ওপর সম। সমে এসে পড়ামাত্রই নন্দা চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ।'

গুরুজি বললেন, 'কি সর্বনাশ হল? কেউ মারাটারা গেল না কি?'

নন্দা নাকি সুরে বললে, 'উঁউ ভাল্লাগে না।'

'ছায়ানট ভাল্লাগে না! এখুনি কবরেজ দেখাও।'

'ধ্যুৎ! ছায়ানট নয়। উলটা পড়ে গেল।'

'তা যাক না। তুলে নাও।

'চৌকির তলায়।'

'হয়ে গেল। ও আর পাবে না। তক্তপোশের তলায় যা মাল আছে! একশো বছরের জিনিসপত্র। মহাভারত। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ওখান থেকে উল উদ্ধার করে? তুমি টানো না। টেনে দ্যাখো, আসে কিনা! কান টানলে মাথা আসে।'

'ধ্যাৎ! টানছি তো। আঁসছে না।'

'তাহলে মনে হয় ঠাকুরদার গড়গড়ায় আটকে গেছে।'

নন্দা আমার দিকে তাকিয়ে, আদুরে অভিমানী গলায় বললে, "বসে, বসে প্যানপ্যানে গলায় কি ঝনকার ঝনকার করছো! দ্যাখো না একবার। না বললে তুমি আর নড়তেই চাও না!'

চিরকাল মানুষ যে ভুল করে আমিও সেই ভুলই করলুম। মেয়েদের কথায় নেচে উঠলুম। তক্তপোশের তলায় ঢুকবো বলে নিচু হচ্ছি, গুরুজি বললেন, 'দাঁড়াও। আমি বলছি, তুমি এখন কি করতে চাইছ?'

'আজ্ঞে এর তলায় ঢুকে ওঁর উলটা।'

'তুমি কি লিভিংস্টোন ?'

'আজ্ঞে।'

'আমি বলছি, তুমি কি ডক্টর ডেভিড লিভিংস্টোন ?'

'না তো ?'

'তা হলে তুমি একটা মেয়ের কথায় নাচতে নাচতে ওই আফ্রিকায় যাচ্ছ কেন ? তোমার কোনো ধারণা আছে চৌকির তলায় কি আছে ! একশো বছরের আবর্জনার জাদুঘর হয়ে আছে। ওই জায়গাটা এমনি কাব্য নয়, মহাকাব্য। স্বয়ং ব্যাসদেবের রচনা। চুপ করে বোসো গানটা তোলার চেষ্টা করো। রাগটা খুব সহজ নয়।'

হারমোনিয়াম পুপুর, পুপুর করে বেজে উঠল। গুরুজি আলাপ শুরু করলেন। এ সব মানুষের কাছে ঘড়িটড়ি কিছুই নয়। সময়ের সঙ্গে এঁরা চলেন না। সময় এঁদের সঙ্গে চলে। নন্দা উল ধরে টানাটানি করছে। অসহায় অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে আমার। অনেকটা বোনা হয়ে গেছে। টানাটানির ফলে চৌকির তলায় গড়াং করে একটা আওয়াজ হল।

বিষ্ণুকুমার বললেন, 'কি করছে বলো তো ?'

এইটাই ওঁর বিশেষত্ব। যার ব্যাপার তাকে জিজ্ঞেস করেন না। তৃতীয় আর একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে চান। আমি বললুম, 'কিছু একটা উল্টে পড়ল।'

'গাড়ু। বুঝলে, গাড়ু ওলটালো। তলায় গোটা দশেক গাড়ু আছে। কেন বলো তো ! আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমার মাকে জিজ্ঞেস কোরো। গাড়ু, পানের ডাবর, পেতলের পিচকিরি এসব মায়ের সাবজেক্ট।' নন্দা বললে, 'বলুন না বাবা, উলের গোলাটা বের করে দিতে।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসেছিলেন বিষ্ণুকুমারজীর বন্ধু, বোধিবাবু। তাঁকে বললেন, 'দমকলে একবার খবর দাও না।'

আমি 'নেওয়ারকি ঝনকার' ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে এলুম। রাতে বসলুম ডায়েরি লিখতে। ভালো উপদেশ শুনতে হয়। আমাদের কালে অন্তত সেই মানসিকতাটা ছিল। আর বলা তো যায় না, একদিন যদি সত্যি মহাপুরুষ হয়ে যাই, তাহলে এই ডায়েরি হবে একটা জাতীয় সম্পদ।

'২ আগস্ট। সকাল। আজ ঘুম থেকে উঠতে অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরি হয়ে গেল। এটা ঠিক নয়। কাল আরও সকালে উঠে বেড়াতে বেরবো। মহাপুরুষ মাত্রেই প্রাতর্ভ্রমণ করেন। তার মানে প্রাতর্ভ্রমণ করলে মহাপুরুষ হয়

এখন থেকেই সকালে না বেড়ালে বাতে ধরবে। আমাদের ফ্যামিলিতে বাত আছে।

দাঁত মাজতে গিয়ে দেখলুম পেস্ট নেই। উনুন থেকে ঘুঁটের ছাই বের করে দাঁত মাজতে গিয়ে এনামেলে চোট লেগে গেল। ভাবছি কাল থেকে নিমদাঁতন করবো। দাঁতন দাঁতের পক্ষে ভীষণ ভালো। বাঙালীর দাঁত, বাঙালীর চোখ, বাঙালীর বুক, বড় দুর্বল।'

এইটুকু লিখে হেসে ফেললুম। এ যেন সেই, বাঙলার মাটি, বাঙলার জল গোছের হয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, ঠিক হচ্ছে তো! একেই তো ডায়েরি বলে। না কি! মন আর কর্ম পাশাপাশি চলবে। এক একটা কাজ, সঙ্গে মানসিক প্রতিক্রিয়া। কমেন্টসই তো সব। এক একটা মন্তব্য যুগেব বাণী হয়ে থাকবে। প্রথমে বড় বই বেরোবে পরে ছোট পকেট সংস্করণ। মানুষের পকেটে পকেটে ঘুরবে। বচনামৃত।

'বেলা আটটা। আজ আকাশ একটু মেঘলা। বুলাদেব ছাতের মাথায় একঝাঁক সাদা পায়রা কবিতার মতো উড়ছে।' ডায়েরি অনেক সময় সাহিত্যেব মতো হয়ে যায়। যেমন এই লাইনটায় হল। পায়রা কবিতার মতো উড়ছে। স্যামুয়েল পেপির ডায়েরি। হ্যারল্ড নিকলশনেব ডায়েরি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডায়েরি। ডায়েরি আর চিঠি সাংঘাতিক জিনিস। কালের কড়চা।

'সকাল আটটার সময় পৃথিবীর সভ্য মানুষ ব্রেকফাস্ট করে। আমাদের ফ্যামিলিতে ব্রেকফাস্টের চল নেই কারণ চাকুরে বাঙালী অদ্ভুত জীব। দশটায় অফিস হলে নটায় ভাত খাবে। নটায় হলে আটটায়। সাতটায় হলে ছটায়। বর্ধমানের ডেলি প্যাসেঞ্জার পাঁচটায় ভাতে ভাত খেয়ে ট্রেন ধরেন। ভরপেট ভাত মেরে অফিস ছোটা। এই হল বাঙালীর ধর্ম। বাবা ব্রেকফাস্ট করেন না। আমরাও করি না। বরাদ্দ, এক কাপ চা।'

এরপর? আটটার পর মহাপুরুষের জীবনে লেখাব মতো আর ঘটনা নেই রে! কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখাটা কি, লেখার মতো বিষয়! লেখার আবার বিষয়! লিখলেই বিষয়। স্বাধীন ভারতের একজন যুবক, সকাল আটটা থেকে বেলা একটা, করার মতো কিছুই নেই। ভ্যারেণ্ডা ভাজা। রোজনামচা লিখতে গিয়ে ধরা পড়ল আমি কিছুই করি না। একটা এঁড়ে গরু বাপের গোয়ালে বহাল তবিয়তে বসে আছি। কাগজ পড়ছি, নভেল পড়ছি, দিবানিদ্রা দিচ্ছি আব তন্দুরস্তি বানাচ্ছি। বাড়ির কেউ আজকাল আর সেভাবে বাক্যালাপ করে না। নাম ধরে ডাকা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। 'এই যে চা'। 'খেতে দেওয়া হয়েছে'।

'বাজার থেকে ফিরেছে কিছু ?' না ফিরলেই বিস্ময়ের উক্তি, 'কি বাজার হলো, যে একপয়সাও ফিরল না !' যেন আমি চোর।

সব পাড়াতেই নেতা থাকেন। দেশ গঠনের চিন্তায় যাঁর রাতে ঘুম হয় না। সাদা, পাটভাঙা খদ্দরের জামা-কাপড়। হৃষ্টপুষ্ট মোলায়েম চেহারা। কাছে গেলে, গায়ে বিলিতি তামাকের মিহি সুগন্ধ। বৈঠকখানা যাঁর খালি যায় না। উমেদারে ভর্তি। নেতাকে একদিন ধরলুম, 'যুবকদের জন্যে কিছু করুন স্যার।'

'কেন, এই তো আমাদের দুর্গাপুর ! আমাদের হরিণঘাটা। অসংখ্য বেকার অ্যাবসর্ব করবে।'

বেকার যেন কালির ফোঁটা। দুর্গাপুর, হরিণঘাটা, স্টেট ট্রানস্পোর্ট ব্লটিং-পেপার।

'ধৈর্য ধরো, নব বাঙলা জাগলো বলে।'

আমাদের পাগলা জগার ডায়ালগ মনে পড়ে গেল, 'ওঠো, মা ওঠো, মোছ তোমাব আঁখিজল, সাতকোটি সন্তানের গলগলগল, গলগলগল।'

গলগলটা হল রক্ত। নেতা প্যাকেটের ওপর ফাইভ ফিফটি ফাইভ ঠুকে ঠোঁটে লাগালেন, 'বুঝলে, শিক্ষিত বাঙালীর কথা ইংরেজরা ভেবে গেছে। আমাদের ভাবতে হবে শ্রমিক বাঙালী, কৃষক বাঙালীর কথা। স্টেটবাসের কণ্ডাক্টব হবে ? ট্র্যাফিক পুলিস হবে ? অমনি মুখ বেঁকে গেল ! দৃষ্টিভঙ্গি পালটাও। বাঙলা আর এক ভাবে জাগছে। এত কাল যারা পেছনে পড়েছিল তারা তৈমুরবাহিনীর মতো এগিয়ে আসছে। এই ট্র্যানজিসানের সময় একটু কষ্ট তো হবেই বাবা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইউ পি এস সি তে, পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে যাও। আমার পিতৃদেব বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। জীবন নিয়ে বেশি ভেবো না। অনাহারে আছ কি ? নেই তো। তাহলে ' শরীরটাকে ঠিক রাখো। গিভ আস সাম টাইম টু রিকনস্ট্রাক্ট দিস কান্ট্রি। জয় হিন্দ।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'মাইরি বলছেন ?'

মাইরি শব্দটা ইলেকট্রিক শকের মতো কাজ করল। ঠোঁটের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে থ্যাতলালেন। লাল লাল গুলি গুলি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোটলোক।'

'আপনারা ছোটলোকদের জন্যেই তো ভারতকে ঢেলে সাজাচ্ছেন। এই তো বললেন !'

'সে ছোটলোক, এ ছোটলোক নয়। তুমি অসভ্য। বাপের বখে যাওয়া

ছেলে।'

'আপনার ছেলে কম্পার্টমেন্টালে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তারপর চাবটে বছর গড়াল। এখন সে দুর্গাপুরে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কেউকেটা। কি ভাবে?'

'তাব ক্যালিবার ছিল।'

'ক্যালিবার ছিল, না, আপনার পাঞ্জাবির জোরে! ফোতো কাপ্তেন জামাইটাকে বিডলা বাড়িতে বসালেন কি ভাবে! ভারত জাগছে না আপনার ভাগ্য জাগছে!'

'গেট আউট। আই সে গেট আউট।'

'আপনি এত দামী বিলিতি সিগারেট খান? স্বদেশী বিড়ি কি হল?'

'বেশ কবি। তুমি বেরোও। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

খদ্দরের পাঞ্জাবির মোড়কে গদগদে একটা শরীর নড়ে চড়ে উঠল। পচা মাছের গন্ধ নাকে এল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললুম, 'কবে আপনারা যাবেন? বিদায় হবেন কবে?'

নেতা টেবিলের ওপর থেকে অ্যাশট্রেটা তুলে আমার দিকে ছুঁড়লেন। গায়ে লাগল না। দেযালে লেগে ঢাকনা খুলে সিগারেটের টুকরো আর ছাই মোজেকেব মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পাখার বাতাসে সব উড়ে এধার ওধার হয়ে গেল। আমি সেই মুহূর্তে ছোট্ট আব একটি প্রশ্ন ছুঁড়লুম, 'আপনি তো কোথাও চাকরি কবেন না, স্পোর্টস কাউনসিলের অনারারি সদস্য; কিন্তু তিনতলা বাড়িটা তো বেশ হাঁকিয়েছেন।'

ভদ্রলোক তিড়বিড়, তিড়বিড় করে উঠলেন। আমি আর দাঁড়ালুম না। সোজা রাস্তায়। সেদিন বাতে ডায়েরিতে লিখলুম, 'ঈশ্বব মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান উলঙ্গ করে। সে শার্টিনের জামা পরবে কি মার্কিনেব জামা কি উলঙ্গ হয়ে থাকবে, ঠিক করবে মানুষ। রাজার ছেলের মখমল। ফুটপাথের ছেলের ছেঁড়া ট্যানা। মানুষের হাত থেকে মানুষ যতটা আদায় করে নিতে পারে। কাড়াকাড়ি কাড়াকাড়ি কবতে করতে একদিন জীবন শেষ। কেউ নিজেব কোলে একটু বেশি ঝোল টানবে, কেউ কম। যে বেশি পারবে পৃথিবী তাকে সম্মান জানাবে করিতকর্মা বলে। মানুষেব প্রতি মানুষের কর্তব্য হল তাকে সুস্থির হতে না দেওয়া। জীবন থেকে অনায়াসে কেউ যেন ভেগে পড়তে না পাবে। তুমি ভোগ করছ করো, আমার নুনের ছিটেও ঠিক থাকবে। গোলাপে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন তিনি। কাঁটা। মধুতে মৌমাছির হুল।'

সেদিন আমরা সত্যকে পুলিসের খপ্পরে ফেলেছি। রেশানের দোকান থেকে চাল, গম, চিনি পাচার করে বেশ মোটা হচ্ছিল। আমরা ব্যাপারটার দিকে নজর রাখছিলুম। সত্য কিছুকাল আমাদের সহপাঠী ছিল। ইদানীং খুব ত্যাড়াংব্যাড়াং কথা বলতো। 'আব লেখাপড়া কবে তোমাদেব কি লাভ হলো! শুধু শুধু বাপের টাকা ধ্বংস।' সত্যর ভাঙা ভিটের রূপ খুললো। সত্যর মোটা বউ বাউটি পরে বিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গতব দেখাতে লাগল। ঠ্যালায় চেপে ফ্রিজ এলো। সত্য পৃথিবী থেকে, মানুষের খপ্পর থেকে একটু একটু করে সম্পদ কাড়তে লাগল। সত্য সুখী হচ্ছে। আর থাকা যায় না। অ্যাকশন। রাত আটটায় দোকানের পেছন দিক দিয়ে বস্তা বস্তা চিনি আর চাল পাচাব করছিল। হাতেনাতে ধরা। কিছুই না। কিছুই হবে না। পুলিস যথারীতি ছেড়েই দেবে। তবু একটু খোঁচা। বাড়া ভাতে ছাই। কামাইয়ের পথটা স্মুথ হবে কেন?

প্রশান্ত চলে গেলেও, প্রশান্তদের রকটা ঠিকই ছিল। আর আমাদের বেকাবসভাও নিযমিত চলছিল। সেদিন বকে বসে আছি, পুলিসের ভ্যান এসে পেটাতে পেটাতে থানায় তুলে নিযে গেল। সে কি তম্বি! রিপোর্ট আছে। রিপোর্ট। রকে বসে বসে মেয়েদেব টিজ্ করা হয়। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি আব ইঙ্গিত। উল্টেপাল্টে বেধড়ক ধোলাই দিলে। মুশকো মতো এক পুলিস। ময়লাটে সাদা ইউনিফর্ম। ঘেমো গন্ধ। ওসি বলল, 'প্যাঁদা শালাকে। বেশ করে প্যাঁদা।' কচুরি ধোলাই খেতে খেতে এক লহমায় মনের মধ্যে খেলে গেল। এ ওই জননেতাব কাবসাজি। পুলিসকে দিয়ে একটু টাইট দেওয়ালে। এরপর কম্যুনিস্ট বলে জেলে পুবে দেবে। তখন বাঙলায় মোগলসাম্রাজেব পতনের কাল। পুলিসের টর্চার করার অনেক কায়দা জানা আছে। গবম মোমের টোসা ফেলে দিলে শবীরের সবচেয়ে নরম জায়গায়। আমার লাইফে অমন যন্ত্রণা আমি কোনওকালে পাইনি। হার্ট শক্ত ছিল, তাই হার্টফেল করলুম না। আমাকে ফের ভ্যানে তুলে, রাতের অন্ধকারে ধাপার মাঠে ফেলে দিয়ে এলো।

বাড়িতে যেটুকু খাতির ছিল, তাও গেল। অবশ্য খাতিরের পরোয়া আমার ছিল না। আমাব সেই অসাধারণ বিলিতি ডায়েরিতে আমি লিখলুম, শিরোনাম দিলুম, 'মেশিনারি অফ কোয়ারশান, নিপীড়নের যন্ত্র। এই যন্ত্রটি ছাড়া শাসকগোষ্ঠী অসহায়। নীতি শব্দটা মানুষের কল্পনা। দুর্নীতিটাই বাস্তব সত্য। ন্যায়ের দণ্ডকে ব্যবহার করতে হবে দুর্নীতির কাজে। যে চ্যালেঞ্জ করবে তাকেই প্যাঁদাও। দেশ একটা সুস্বাদু পিঠে। ক্ষমতা হল ভোজসভা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা টেবিলে। আব সমর্থকরা মাটিতে বসে হাঁ করে আছে। যার মুখে

যেমন প্রসাদ এসে পড়ে।'

যাক আমার ভাত জল খাওয়া ডায়েরিতে বেশ কিছু ঘটনা জমছে। এক পয়সার ট্রাম আন্দোলনের পর বিরোধী শক্তি বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। ভালই হয়েছে। দেশটা একেবারে ভেটকে গেছে। আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে, মেয়ে বলেই সরকারী দপ্তরে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি পেয়েছিল। বছর না ঘুরতেই অফিসাব তাকে মা বানিয়ে ছেড়ে দিলে। সবাই বললে পাঁচটার পরই সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাঘের কাজ বেড়ে যেত। তিনি একটু তান্ত্রিক ধরনের ছিলেন। চারপাশে শক্তিসাধনার বড বড় পীঠস্থান বেরিয়ে পড়তে লাগল। রাজার ছিবড়েরা জাস্টিস জাস্টিস বলে চেল্লাতে লাগল। কোথায় জাস্টিস। দেশ এতকাল পরাধীন ছিল। কত ফাইট করে স্বাধীন কবা হয়েছে। এখন একটু 'সাম্পচুয়াস ব্রেকফাস্ট' হবে না! শিবপুরের কোম্পানিবাগানে মধুচক্রের সন্ধান বেরিয়ে পড়ল। রাজার দুধপুকুর আর হল না। হয়ে গেল জলপুকুর। ভাসছে কচুবিপানা। এই সময এক নেতা দেশবাসীকে কাঁচকলা খাবার উপদেশ দিলেন। আব এক প্রতাপান্বিত কিং-মেকার সভাসমিতিতে বলতে লাগলেন, 'কে বলেছে, দেশ দরিদ্র হয়েছে। এই তো সভায় যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকলেরই পরনে কাপড আছে।'

পার্বতীব বাবা কিন্তু আমার হেনস্তার পেছনের চক্রান্তটা বুঝলেন। ঘুস দিতে দিতে তিনি ক্লান্ত। সিমেন্টের বদলে গঙ্গামাটি দিযে কাজ করে এসে, রাতে দুচোখের পাতা এক কবতে পারেন না। ব্রিজ ভাঙছে। ছাদ ধসে পড়ছে। পিলাব শুয়ে পড়ছে। লোযেস্ট কোটেশান, তার ওপর হাফাহাফি বখেরা। তিনি সান্ত্বনা দিলেন, 'অপেক্ষা করো। পরের নির্বাচনে সব উল্টে যাবে। সব কিছুর একটা শেষ আছে। পাপেরও শেষ আছে। পুণ্যেরও শেষ আছে।'

খাদ্য আন্দোলন দাবাবার জন্যে মিলিটারি নেমে গেল। দুই মহামান্য স্থপতিকে লোক অন্য নামে ডাকতে শুরু করেছে। খুবই কুৎসিত নাম। আমি আর বিশ্বনাথ বেড়াতে বেড়াতে টালাব ব্রিজের কাছে এসেছি। সারা শহর শ্মশান। ব্রিজের কাছে এসে আটকে পড়েছি। পাকপাডার কাছে দুটো মিলিটারি ট্রাক থেমেছে। ভয়ে পথচারীবা থমকে গেছে। বিশু বললে, 'দাঁড়া না, ভয়ের কি আছে! মিছিল ফিছিল কিছুই নেই, শান্ত মানুষকে ওরা কি করবে!' মিলিটারিরা এপাশের ওপাশের গলিতে ঢুকলো। আবার বেরিয়ে এল। তারপর কটকট করে কয়েকবার শব্দ হল। ভীতু বাঙালী দৌড়োচ্ছে। বিশু বললে, 'এ কি রে! তোর জামার বুকে এটা কি!'

বুকপকেটের ঠিক ওপরে লাল রঙের ঘি ঘি মতো এক টুকরো কি লেগে আছে। তখনও কাঁপছে থিরথির করে। যেন জীবন্ত এক প্রাণী। পাশে তাকিয়ে দেখি, আমার বয়সী একটি ছেলে ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথাটা চুরমার হয়ে গেছে। বিশু বললে, 'তোর জামায় ঘিলু আটকে গেছে। গুলি চালাচ্ছে। গুলি। পালা পালা।' আমরা দৌড় লাগালুম চিৎপুরের দিকে। দৌড। দৌড।

একেবারে গঙ্গার ধারে এসে দুটো শ্রান্ত কুকুরের মতো আমরা হাঁপাতে লাগলুম। জায়গাটা নিরাপদ মনে হল। আমরা দুজনে বিচিলিঘাটে পাশাপাশি বসলুম। দৌড়োবার সময় বুকের কাছে লেগে থাকা সেই জিনিসটা খুলে পড়ে গেছে। শুধু একটু লাল দাগ লেগে আছে। বিশু বললে, 'জামাটা কেচে নিবি?'

'কাচবো কেন? থাক! হ্যাঁ রে আমরা মানুষ?'

'কেন? এ কথা তোর মনে হবার কারণ?'

'আমরা প্রাণভয়ে ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে এলুম?'

'তা কি করবো! ও তো মারা গেছে।'

'তা হলেও, দেখা উচিত ছিল।'

সামনে গঙ্গা বয়ে চলেছে, ছলাত ছলাত শব্দে। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকো তালে তালে দুলছে। দিন শেষ হয়ে গেল। সূর্য তলিয়ে গেছে ও জগতে। রাঙা আকাশের গায়ে কালো হয়ে আছে মন্দিরের চূড়া, ঘরবাড়ি। ঝাপড়া গাছ। কি বিষণ্ণ ছবি! দিনের মৃত্যু। পাল তোলা নৌকো উদাসী পথিকের মতো জল কেটে চলেছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে। এদিকে শান্ত, পবিত্র ছবি। ওদিকে মানুষের তাণ্ডব। ছেলেটা এই ছিল এই নেই। মানুষের হাতে পড়ে মানুষের কি অবস্থা! স্টেট। রাজ্য রাজত্ব দানবের মতো, লোহার সাবমেরিনের মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

বিশু বললে, 'ধ্যাস শালা।'

'কি হলো?'

'মানুষের হাতে মরার চেয়ে আয় আত্মহত্যা করি।'

'নেভার। শেষ পর্যন্ত যাবো। বই শেষ করে মরবো।'

বিশুর খুব লেগেছে। আমার লেগেছে, তবে হালফিল আমি জলজ্যান্ত প্রশান্তকে বিষ খেয়ে মরতে দেখেছি। ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা। আমি ভাবছি অদৃশ্য গুলি আর একটু এগিয়ে এলেই হয় বিশু, না হয়, আমি, যে কেউ একজন খতম হয়ে যেতুম।

বিশু উঠে দাঁড়াল। স্থির হয়ে বসতে পারছে না। এপাশ ওপাশ দুপাক ঘুরে এল। তারপর হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল,

Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau
Mock on, mock on, it is all in vain
You throw the sand against the wind
And the wind blows it back again.

দু একজন বৃদ্ধ এপাশে ওপাশে বসেছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে বিশুর দিকে তাকালেন। এই ঘাটে এক সময় গিরীশ ঘোষ হয় তো বেড়াতে আসতেন। এই ভাবে বিশুকে উইলিয়াম ব্লেক আবৃত্তি করতে দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। আমাদের মধ্যে বিশু খুব পড়ুয়া ছেলে। বিশু হা হা করে হাসল আবার, 'মক অন, মক অন'।

'বিশু বোস। লোকে তোকে পাগল ভাববে। বড় ভালো জিনিস ধরেছিস।'

বিশু বসল। একটা জেলে নৌকো যাচ্ছিল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গো কত্তা ইলিশ আছে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে নৌকো ভেসে গেল উত্তরে। এর মধ্যে একজন এসে বললে, ওঃ সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে শ্যামবাজারে। মিলিটারি গুলি চালাচ্ছে। দুধের গুমটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডে যে স্ট্যাণ্ড থাকে, তাইতে আগুন লাগিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছে। আজ কারফিউ হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাট খালি হয়ে গেল। সন্ধ্যাহ্নিক, ইলিশ সব মাথায় উঠে গেল। মৃত্যুভয় এমন ভয়? যাঁরা শেষ পারানির কড়ি কুড়োতে এসেছিলেন তাঁরাও কড়ি ফেলে কোটরের দিকে ছুটলেন।

'খোকা কারফিউ।'

'মরুকগে কারফিউ। আই ডোন্ট কেয়ার। তুই তো ব্লেক আওড়ালি, ব্লেকের একটা ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে নে, A dog starved at his master's gate, Predicts the ruin of the state. আমরা কি সেই অবস্থায় আসিনি?'

সত্যিই কারফিউ হয়ে গেল? রাস্তাঘাট ভোঁ ভোঁ। বিশু বললে, 'একবার বেঁচেছিস এইবার কি হবে!'

'শঠে শাঠ্যং। জামা প্যান্ট খুলে পাগল সেজে হাঁট।'

'এক সঙ্গে এক জোড়া পাগল দেখলে পুলিস ছেড়ে দেবে?'

'তাহলে গলি মার। গলির গলি তস্য গলি।'

বড় রাস্তায় ট্রামলাইন শীতল ভাবনার মতো এপাশ থেকে ওপাশে সটান পড়ে

আছে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আমরা সুযোগ খুঁজছি। রাস্তাটা পেরোতে পারলেই আবার গলি। গলির মতো জিনিস নেই। একটা ট্রাক গাঁগাঁ করে চলে গেল। ইউনিফর্ম পরা আমাদেরই কিছু জাতভাই, হাতে বাঘমারা রাইফেল। মারার মতো মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছে।

'নাইট অফ অল নাইটস', তখন বয়েস কম ছিল, এই ভাবেই যা খুশি তাই লেখা যেত ডায়েরিতে। ওই রাতেই পার্বতীর আস্ত্রিক হল। সে কি কাণ্ড! যত রাত বাড়ছে তত গোলমাল বাড়ছে। বেতারের সংবাদপাঠক ভারী গলায় পড়ে গেলেন, কলকাতা জ্বলছে। জেলা শহর ফুঁসছে। একটা ঐতিহ্যবাহী দল, সেই দলের নেতারা নিজেদের কফিনে পেরেক ঠুকে চলেছেন।

অতি কষ্টে একটা অ্যাম্বুলেন্স্ আনানো সম্ভব হল। রাত প্রায় দশটার সময় আমরা পার্বতীকে নিয়ে বেলেঘাটার হাসপাতালে যাবো বলে বেরিয়ে পড়লুম। আমার বিখ্যাত বউয়ের কোনো কিছুই ছোটখাটো নয়। সারাজীবন নিজে নাচলো, অন্যকেও নাচালো। বড়দের সবই বড় ব্যাপার। বিয়ের পর আমার সঙ্গে মুসৌরী গেল। রাত দুটোর সময় কম্বলের তলায় শুরু হল হিক্কা। কোঁক, কোঁক। ওই শীতের রাতে আধ কুঁজো জল সাবাড় হয়ে গেল, তবু কোঁক কোঁক কমল না। শেষে হোটেলের ম্যানেজার। তার ধারণা, অ্যায়সা কুছ খায়া। ম্যানেজারের নিজের অবস্থাই তখন টলমল। পুরো বোতল পেটস্থ করে লেপের তলায় সবে ঢুকেছিল। সে এক একবার আমার বউকে দেখে আর বলে, 'আই বাপ। ক্যায়সা খেল।'

শেষে আমার মনে পড়ল আচমকা ভয় দেখালে হেঁচকি কমে যায়। আনারকলির বীণা রায়ের মতো হেঁচকি তুলেই যাচ্ছে। আমি হঠাৎ বলে উঠলুম, 'সরো সরো কম্বলে কাঁকড়া বিছে। বিরাট বিছে।' কম্বল ফেলে বউ মারলে বিশাল লাফ, একেবারে ম্যানেজারের ঘাড়ে। সে বেচারা এমনিই টলছিল। অতখানি এক মহিলার ভারে কুপোকাত। হিক্কা বন্ধ হল।

আইবুড়ো বেলায় শুরুটা হল কারফিউয়ের রাতে কলেরা দিয়ে। খেয়েছিলেন চিংড়িমাছ। ফ্রেশ বাগদা। বাপের কাঁচা পয়সা। ওদিকে খাদ্যের অভাবে দেশ জ্বলছে এদিকে মেয়ে ফ্রেশ বাগদা খেয়ে বেড়াতে চলেছেন। মাথার কাছে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে বসে আছি। অ্যাম্বুলেন্স্ হুহু করে ছুটছে। রাস্তায় একটা লোক নেই, গাড়ি নেই। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মাঝে মাঝে দূর থেকে কটকট শব্দ ভেসে আসছে। হাতিবাগানের কাছে একটা দুধের ডিপো আর বাসগুমটি জ্বলছে। পোড়া বাসের কঙ্কাল রাস্তার মাঝখানে যেন অট্টহাসি হাসছে। গাড়ি

চলছে। দু জানলা দিয়ে বাতাস আসছে ; তবু আমি হাতপাখা নেড়েই চলেছি। রাস্তায় কোথাও ট্র্যাফিক পুলিস নেই। একটা দুটো মিলিটারি ট্রাক মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে কখনো পেছন থেকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে। কখনো সামনে থেকে এসে পেছনে। যখনই উদয় হচ্ছে বুকটা কেমন করে উঠছে। পার্বতী হঠাৎ আমার ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরল। হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। পার্বতী কথা বলতে পারছে না। কোনওরকমে ফিস ফিস করে বললে, আমি বাঁচবো তো!'

'কেন বাঁচবে না। গেলেই স্যালাইন দেবে, কাল সকালে ফ্রেশ। তুমি যাবে কি? এখনও তোমার কত কাজ বাকি! কত নাচবে! হাততালি পাবে। কাগজে ছবি ছাপা হবে।'

'হাসপাতালে তুমি থেকো। কি থাকবে তো!'

'যদি থাকতে দেয় অবশ্যই থাকবো। তোমাকে সুস্থ করে নিয়ে আসবো।'

বিয়ে না করা অবধি বউকে কত ভালো লাগে। প্রেমে ভেতরটা দুধ ওতলানোর মতো ওতলায়। কি যে হয়। ভেতরে সিটি মেরে রেলগাড়ি ছুটতে থাকে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন, 'কেসটা কি?'

'চিংড়ি মাছ।'

'এই পচা চিংড়ি খেয়েই বাঙালী জাতটা শেষ হয়ে যাবে।'

সিস্টারকে ডেকে বললেন, 'চিৎ করে বেডে ফেলো। আর ওই তো এক দাওয়াই, স্যালাইন আর গ্লুকোজ রেডি করো চালিয়ে দি।'

আমি বললুম, 'জানেন কি? প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। ওইভাবে চিৎটিৎ বলছেন।'

'ধ্যার মশাই! কলেরার আবার নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী। আপনি দয়া করে আসুন। কাল ভিজিটিং আওয়ার্সে খবর নেবেন।'

'আমি আজ রাতে থাকবো।'

'থাকবেন মানে, মামার বাড়ি?'

মুখ চুন করে বেরিয়ে আসছি ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'থাকতে চাইছেন কেন? লাভ?'

'আজ্ঞে অনেকটা তাই।'

'অনেকটা কেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পুরোটা। চিংড়িমাছ আর প্রেম বাঙালীকে শেষ করে দিলে। শেষ করে দিলে। ঘরে ঘরে প্রেম। থাকার কোনও দরকার নেই। কি হবে শুধু শুধু নিচের এই বেঞ্চিতে বসে মশার কামড় খেয়ে?'

দু'কদম এগিয়েই মনে হল, ওরে বাবা, প্রেমের চেয়ে বড় ব্যাপার বাইরে হয়ে

আছে, 'কারফিউ'। বেরিয়ে হাতখানেক হাঁটলেই গোর্খা রাইফেলে মাথায় চাঁদমারি হয়ে যাবে। হসপিট্যাল সুপারকে বললুম, 'স্যার! আমাকে থাকতেই হচ্ছে। প্রেম নয়। কারফিউ।'

'তাহলে থাকুন।'

ভদ্রলোক গটগট করে চলে গেলেন। হালকা একটা শিস। হিন্দী ছবির হিট গানের সুর। বেশ আছেন। কলেরা, ডিপথিরিয়া, পকস। কাতরানি। মৃত্যু। ইনফেকসান। আমরা হলে ইনফেকসানের ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতুম। ভদ্রলোক তারিয়ে তারিয়ে চা খেলেন। দিশি বিস্কুট। হাত ধোবার বালাই নেই।

ঘরের বাইরে বারান্দা। আলো জ্বলছে ঘোলাটে। আলোর নিচে আলোর শেড পরিষ্কার করা হয়নি কতকাল। ভেতরে গতবছরের দেয়ালি পোকা মরে জিরে জিরে হয়ে আছে। চওড়া একটা বেঞ্চ। জায়গায় জায়গায় চায়ের দাগ শুকিয়ে আছে। খানিকটা জায়গা পুড়ে কালো হয়ে আছে। বেঞ্চের তলায় একটা আরশোলা স্বাস্থ্যবান খেজুরের মতো নড়া-চড়া করছে। বেঞ্চের একপাশে বসলুম। এইখানেই রাত কাটাতে হবে। অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে। পেট জ্বলে যাচ্ছে। খাবার কিছু নেই। চারপাশে অসুখের গন্ধ আর লাইজলের গন্ধ। কোথা থেকে একজন হিন্দুস্থানী এসে বসলেন। সেই অদ্ভুত কায়দায় কাপড় পরা। পেছনের কাছার একটা অংশ ধর্মধ্বজের মতো ঝুলছে। সাদা ফুল শার্ট। পইতে চাবি সমেত ঝুলছে। বুকপকেটে ঠাসা কাগজ। পায়ে ফিতে খোলা বুট জুতো।

একটু আলাপের চেষ্টা করলুম, 'আপনি কি পুলিসে কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক।'

'কি হয়েছে আপনার?'

'আমায় হয়নি, আমার বউয়ের টিটেনাস হয়েছে। বাঁচবে না মনে হয়।'

লোকটি বিমর্ষ হয়ে বসে রইল। পকেট থেকে গোল গোল দুটো কৌটো বের করল। একটা থেকে নিল দোক্তাপাতা, আর একটা থেকে চুন। হাতের তালুতে ফেলে ডলতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ডলার পর বললে।

'খইনি চলবে?'

'কখনও খাইনি।'

'একটু লাগান না। সারারাত কাটাতে হবে তো। শরীরটা বেশ চনমন করবে।'

কি মনে হল, বললুম, 'দিন, এক চিমটে।'

'নিচের ঠোঁট আর দাঁতের মাঝখানে রেখে দিন।'

যা বললেন তাই করলুম। লোকটির স্বাস্থ্য বটে! দেখার মতো। আমার পায়ের মতো এক একটা হাত। গর্দানখানা কি? যেন অশোকস্তম্ভ। বুকটা যেন খেলার মাঠ। কি করে এমন শরীর করেছে কে জানে! আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আজ পর্যন্ত কত জনকে পিটিয়েছেন?'

লোকটি হেসে বললে, 'একজনকেও না। আমি মুখ্যমন্ত্রীর বডিগার্ড।'

'ইচ্ছে করলে অনেককে পেটাতে পারতেন?'

'আপশোস। সেদিন অ্যাসেমব্লিতে এক বাবুর ঘাড়টা ধরেছিলুম এমন চিঁচি করে উঠল ছেড়ে দিলুম। বিরোধী দলের মেম্বার। মুখ্যমন্ত্রীকে কামড়াতে এসেছিল।'

'কামড়াতে?'

'আপনি অ্যাসেমব্লিতে যাননি? যখন সভা চলে। গেলে দেখবেন। কি মজা? বিধায়করা ভালো কুস্তি করে।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল, মাথার উপর আলোটা ঘুরছে। বাঃ বেশ লাগছে তো। সামনের দেয়ালটা দুলছে। বেঞ্চটা ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আবার সোজা হচ্ছে।

আমি বললুম, 'ভূমিকম্প হচ্ছে। সেরেছে।'

লোকটি বললে, 'ভূমিকম্প নয়। আপনি খইনির থুক গিলেছেন। একটু শুয়ে পড়ুন। আরও মজা লাগবে।' লোকটির দিকে মাথা করে শুয়ে পড়লুম। সত্যিই বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে কাঠের পাটাতনে চিৎ করে ফেলে আমাকে চরকিপাক খাওয়াচ্ছে। খইনির প্রেমে পড়ে গেলুম। এক চিমটেতে এত আনন্দ?

পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস একটু একটু করে মানুষকে কেমন ধরে! প্রথমে ধরল বউ। বউকে ধরল আন্ত্রিক। আমাকে ধরল হিন্দুস্থানী পুলিস। পুলিসে ধরাল খইনি। জিনিসটা কেমন জমে গেল। সারাটা রাত বোঁ বোঁ করে ঘুরেই গেলুম। বউও যে এইভাবেই ঘোরাবে, এ ছিল তারই ইঙ্গিত। প্রথমে বুঝিনি। পরে বুঝেছি। সেই ইংরেজি প্রবাদটি কত সত্য, কামিং ইভেন্টস কাস্ট ইটস শ্যাডো।

মাথা আরও ঘুরে গেল সকালে, আজ বাংলা বন্ধ। লাও ঠ্যালা। সুপার তার অফিসঘরে বসে হাণ্ডা কাপে চা খাচ্ছেন। ফিকে ধোঁয়া উঠছে। আর সেই পুলিস ভদ্রলোক বারান্দার দূর কোণে, জামা খুলে মালকোঁচা মেরে হোঁত হোঁত করে বৈঠক মেরে চলেছেন। একের পর এক, শেষ নেই। ভেবেছিলুম সুপার হয়তো বলবেন, 'কি ভাই, ঘুম ভাঙলো। এসো চা খাও।' দুনিয়া অত সহজ জায়গা

নয়। ভাব ভালোবাসার বন্যা বয় না। ওই ছোটখাট খানাডোবা সব। এক ঘটি ভালোবাসা, এক বতি স্নেহ।

সুপারকে গিয়ে বললুম, 'কি করবো স্যার! আজ যে বাঙলা বন্ধ।'

'সেটাও আমাকে ভাবতে হবে? অ্যাম্বুলেনসে করে বাড়ি পাঠিয়ে দোবো!'

'না, তা বলিনি?'

'তা হলে! বাঙলা বন্ধ উঠিয়ে নোবো?'

'না, তা বলিনি।'

'তা হলে ওই কথাটা বললেন কেন?'

'অন্যায় হয়ে গেছে।'

কলকাতার পুলিসেরও দয়ার শরীর হয়। আড়াইশো বৈঠক মেরে, পাঁচশো ডন মেরে, চওড়া ছাতি আরও চওড়া করে ভদ্রলোক আমার কাছে এসে সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার বউ বোধ হয় বেঁচে গেল।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'যাক বাবা আর বিয়ে করতে হবে না।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনার রুগীর খবর কি?'

ওয়ার্ডে তো ঢুকতে দেবে না। বাইরে থেকে খবর নিয়ে জানলুম, ভালই আছে। এ যাত্রা বেঁচে গেল। রুগী খুব ঘুমোচ্ছে। পুলিস ভদ্রলোক নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি যাবেন কি করে? আজ তো বন্ধ!'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, 'কি করে যাবো?'

'আমার জন্যে একটা জিপ আসবে। যাবো শ্যামবাজার।'

আমি ভদ্রলোকের ভুঁড়িটা জড়িয়ে ধরলুম। ভদ্রলোক পিতার মতো আমার মাথায় হাত রাখলেন। পৃথিবীতে আছে সব, আদায় করে নিতে হয়। মাটির ওপরে জল নেই। খুঁড়লে জল বেরোয়।

জিপ চলেছে। দুই হিন্দুস্থানী দেশোয়ালি ভাষায় সুখ দুঃখের কথা বলছে। সারা পশ্চিমবাঙলা উত্তাল। প্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতি কেউ বরদাস্ত করতে পারছে না। বামজোট জবর আন্দোলনে নেমেছে। বিধানসভায় তো কেলোর কীর্তি হচ্ছে। থেকে থেকে হাতাহাতি। রক্তপাত। স্পিকারের ডাণ্ডা তুলে ধোলাই। বিজয় সিংহ নাহার কাগজ দেখে কি একটা পড়ছিলেন, বিবৃতি। জনৈক বিরোধী সদস্য তাঁর হাত থেকে কাগজ কেড়ে নিতে এলে এক থাপ্পড় লেগে গেল খণ্ডযুদ্ধ। স্পিকার মার্শাল তলব করলেন। বিরোধীদের সভাকক্ষ ত্যাগ। কাশীকান্ত মৈত্র সাংঘাতিক ফাটাচ্ছেন।

দুজন পুলিসের কথা শুনে মনে হচ্ছে, জমানা এইবার উল্টে যাবে। আর কি হবে। ওদিকে নেহরু গেলেন, এদিকে ডাক্তার রায়। কংগ্রেস তো নড়বড়ে হবেই। কাগজে বড় বড় হরফে, ব্যানার হেডলাইন, উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণনগর, বাণাঘাট ও শান্তিপুরের পরিস্থিতি গুরুতর। বহু সরকারী অফিস, রেলস্টেশন, ট্রেন ভস্মীভূত। সৈন্য তলব। পশ্চিমবাংলার সকল স্কুলকলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। পুলিসের গুলিতে নিহত আনন্দ হাইতের মৃতদেহের দাবিতে জনতা কর্তৃক থানা আক্রমণ।

হয় না, হয় না করে পশ্চিমবাংলা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। চাকরি নেই বাকরি নেই। পচা চালের পিণ্ডি খাও আর বুকে বসে বাঘ মারো। পচা পুকুরের মতো বদ্ধ জীবনে আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। কাগজের ওপর সব পেছন উল্টে পড়েছে। সকলেই একমত, ঠিক হয়েছে শালা। শিক্ষার দরকার ছিল। স্বজন-পোষণ।দুর্নীতি। আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছি। কার স্বাধীনতা! পলিটিসিয়ান, পুলিস, চোরাকারবারি, দুনম্বরি ব্যবসাদার, আমলা, গামলা, এদের স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষের কাচকলা।

পাড়ার রমেনবাবুর বিলিতি কলাগাছে, দুটো কাঁদি পড়েছিল। ছেলেরা কেটে এনে, এক একটা কলার সঙ্গে কায়দা করে আমপাতা বেঁধে ল্যাম্প পোস্টে পোস্টে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কাচকলা খাও হরিকে গুণ গাও। দুপুরবেলা আমাদের পাড়ার ফাইভ ফিফটি ফাইভ নেতার বাড়ি চড়াও হয়ে মাঠ ময়দান করে দিলে। পুলিস আসছে। কে একজন বললেন, 'খোকা পালা। এসেই তোকে তুলবে। এবার আর ছেড়ে কথা কইবে না। পিটিয়ে খাঁচা দুমড়ে দেবে।'

মোড়ের মাথায় তিন দিক খোলা ফুরফুরে জায়গায় আমাদের জননায়ক ঝকঝকে তিনতলা বাড়ি হাঁকড়েছেন। তিনতলার ছাদ জাল দিয়ে ঘেরা। মাঝখান থেকে উঠে গেছে আলোকস্তম্ভ। রাতে দুধ-সাদা আলোর ঝরনাধারা নামে ছাদ-বাগানে। কারা আসে কে জানে। মাঝে মাঝে হাসির হুল্লোড় ঝাঁক পায়রার মতো উড়ে যায়। রাস্তার দিকের বারান্দায় সময় সময় একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকে এলো চুলে। যেন কতকালের বিরহী।

আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল, বেশ বড় সাইজের একটা ইঁট মেরে সিঁড়ির বাহারি কাঁচ ভেঙে চুরমার করে দোব। আমার ঘৃণা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। বাড়ির সামনে তখনও বেশ উত্তেজনা। আমি একটা আধলা ইঁট তুলে ঝেড়ে দিলুম। কাঁচ ভাঙার শব্দের মধ্যে প্রতিবাদের চেয়ে কারাই বেশি। অত বড় একটা ইঁট মারলুম, ভেবেছিলুম পুরো স্যাসটা ভেঙে পড়ে যাবে, কিছুই হল

না। গোটা তিনেক রঙিন কাঁচ ঝন্ করে ভেঙে কার্নিশে পড়ল। তার মধ্যে বর্শার ফলার মতো একটা টুকরো নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলের ব্রহ্মতালুতে পড়ে গিঁথে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ষণ্ডামার্কা আর একটা ছেলে, যে ঘটনাটা দেখছিল ধাঁ করে এসে ঠাস করে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। 'ইয়ারকি হচ্ছে! কে ইট ছুঁড়তে বলেছিল। এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। গাধা কাঁহাকা।'

যার মাথায় কাঁচ ঢুকেছিল, সে বসে পড়েছে মাটিতে। মুখফুক কুঁচকে একপাশে হেলে পড়ে এমন একটা ভাব করেছে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক অনেকে ঘিরে ধরেছে। একজন কাঁচের টুকরোটাকে টেনে তুলতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বললে, 'খুনকা বদলা খুন। এ শালা, দুলাল ভড়ের দালাল। আমাদের কমরেডকে চোট করে দিয়েছে।' আমাদের নেতার নাম, দুলালচন্দ্র ভড়। 'ইন কিলার' বলে কোথা দিয়ে কি যে কবল বোঝার আগেই আমার সব কিছু ছিঁড়ে গেল। ছিঁড়ে ফাদাফাই। আমি যত বলি, 'কমরেড কুক্ষিগত ক্ষমতার ইন্দ্রপ্রস্থে একটা আধলা ঝেড়েছি,' ততই রগড়ানোর মাত্রা বেড়ে চলে। 'কমরেড, আমি তোমাদের একজন। বিশ্বাস করো ওই দুলালচন্দ্র ভড় আমাকে পুলিস দিয়ে ধরা করিয়ে এই সেদিন বেধড়ক পেটা করিয়েছে কমরেড। তোমরা আমাকে চিনতে ভুল করেছ। আমি তোমাদেরই একজন। আমি রোজ বাথরুমে তিন চারবার চিৎকার করে বলি, 'এ জমানা নিপাত যাক।'

কে কার কথা শোনে! ভাগ্যিস সেদিন চুলটা ছোট করে কেটে এসেছিলুম। তিন চারবার ধরার চেষ্টা করেও পারেনি। হঠাৎ কি হল ভোজবাজির মতো সব অদৃশ্য হয়ে গেল। ফ্ল্যাট হয়ে রাস্তায় পড়ে আছি। বেশ ভালই লাগছে। বোধহয় একটু চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম। অনেক বুটপরা পায়ের শব্দ। বাস্, পুরো ব্যাপারটা লাইনে পড়ে গেল। একটা বঙ্কা টাইপের পুলিস দু'হাত ধরে হিড়হিড়, গিড়গিড় করে টানছে। আর বাকি সবাই বলছে, 'মেরে খগেন করে দে।' অ্যাতো কষ্টেও আমি ফিকফিক হাসছি। এক একজনের কি অদ্ভুত বরাত। যা করতে যাবে তাইতেই গোলমাল। ঘাড় খামচে ধরে ভ্যানে তুলছে, আমি বললুম, 'মশাই, বিক্ষুব্ধ জনগণ আমায় মেরে তুলোধোনা করেছে। কোথায় তাদের ধরবেন, তা না আমাকে ধরে থ্যাঁতলাচ্ছেন।'

পুলিস জাতিটাই এমন, কথা বলেছো কি খেপে গেল। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। পাছায় একটা হাঁটুর গুঁতো মেরে বললে, 'চোপ শালা।'

থানার দিকে গাড়ি ছুটছে। গায়ের পোশাক ফালাফালা গজ ব্যাণ্ডেজের মতো

পতপত উড়ছে। সর্বাঙ্গ কেটে থেঁতলে একসা। এই কিছুক্ষণ আগে এক পুলিস কত স্নেহ করল। আর এখন কি করছে! মনকে বোঝালুম পুলিস আমাদের পিতা। তাই কখনও আদব কখনও শাসন। আবাব একটা প্রবাদও তৈরি করে ফেললুম—এক পুলিসে শীত পালায না।

সেবার যে ও-সি কচুযা ধোলাই দিয়েছিলেন, সেদিন আর তিনি ছিলেন না। তরুণ এক অফিসাব। বেশ দেখতে। হাসি হাসি মুখ। কোলের ওপর ব্যাটম। সেটাকে কচিবাচ্চাব মতো আদর কবতে করতে বললেন, 'আহারে! একেবারে ফাদফাঁই কবে দিয়েছে। ভদ্দবলোকের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না। মাকক। পুলিস যখন হযেছে মাবতেই হবে; কিন্তু এমনভাবে মারবে, বাইরে থেকে যেন বোঝা না যায! আজকাল পুলিস লাইনে নিট কাজ কেউ পারে না। কি করেছিলে সোনা?'

হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। আপন মনে বললেন, 'কি বকম হোলো! খুব চেনা চেনা। চেনা চেনা খুব। কোথায় দেখেছি। দেখেছি কোথায়। তুমি, তুমি, প্রভুপাদের বুকে ছিলে সেদিন? বাইট?'

'বাইট।'

'প্রভুপাদ আমার বউযেব গুরু। সেদিন তুমি অসাধারণ গান গেযেছিলে। তুমি কি গান শেখো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওস্তাদ বিষ্ণুকুমারের কাছে।'

'আরে তিনি তো আমার বউয়ের গুরু। তুমি তো আমার বউয়ের ডবল গুরুভাই। তার মানে তুমি আমার ডবল শালা। তোমাকে তো আমি সহজে ছাড়তে পারি না।'

'ক' বছর দেবেন?'

'না না জেল নয়। পুলিস দেখলেই তোমাদের জেল আর ডাণ্ডার কথা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না। চলো আমার কোয়ার্টারে চলো।'

'এই অবস্থায: এই ফাদফাঁই অবস্থায!'

'তা ঠিক। তোমাকে ঠিক কাকতাড়ুয়াব মতো দেখাচ্ছে। বেশ, আর একদিন আসতেই হবে।'

'আজ এখন আমাকে কি করবেন?'

'সসম্মানে জিপে তুলে তোমার বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। তুমি নয়, আপনি বলাই উচিত।'

'আর থাক জুতো মেরে গরু দান করতে হবে না।'

'অভিমান হয়েছে। অভিমান।'

ফোন বেজে উঠল। অফিসার কথা বলছেন। চারপাশের অবস্থা খুব খারাপ। ভীষণ খারাপ। শহর জ্বলছে। এরই মধ্যে বিশ তিরিশ জায়গায় গুলি চলে গেছে। আর্মি মার্চ করছে। কারফিউ হবে। অফিসার ফোন নামিয়ে একটি কথাই বললেন, 'লে হালুয়া।'

পত পত করে ছেঁড়া ফালাফালা জামা পরে পতাকার মতো বাড়ি ফিরে এলুম। বাবা মাকে বললেন, 'বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে বিপ্লবী এলেন। লং লিভ রেভলিউশান।'

একটা জিনিস বুঝে গেছি, পৃথিবীতে কোনও কিছু গ্রাহ্য করবে না। রাজনৈতিক ধস্তাধস্তিতে সাধারণ মানুষ মরবে। যত মরবে তত নেতাদের কদর বাড়বে। যুদ্ধে জেনারেলরা ফ্রন্ট লাইনে লড়তে যান না। দূরে বাংকারে বসে কলকাঠি নাড়েন। ইতিহাস তাঁদের কথাই লিখে রাখে। বাকি সব গাদার মড়া। সংখ্যা। ক্যাজুয়্যালটিস। জিন্না, নেহরু বড় বড় ছবি। ছেচল্লিশে যারা ফৌত তারা সব নামহীন, মুখহীন নাগরিক। সোজা হিসেব রেখে গেছেন মোরো— The world is divided into people who do thinks and people who get the credit রাজনৈতিক নেতারা হলেন কলম্বাস। যখন জলে ভাসলেন, তখন জানেন না কোথায় গিয়ে ঠেকবেন। যেখানে গেলেন, জানেন না কোথায় এলেন। যখন ফিরে এলেন তখনও জানেন না কোথা থেকে এলেন। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল জনসাধারণের টাকায়।

সারা গায়ে মারকিউরোক্রোম মেখে লাল হয়ে বসে আছি। তিনটে জিনিস খুব কাজে দেয়, ভালো গুরু, সংগীত আর জ্যোতিষ। গুরু আর সংগীত হয়েছে। এইবার একটু অ্যাস্ট্রোলজি। তারপর, ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও আমার এই পানসি তরী। জ্যোতিষী অজিতবাবুকে ছকটা একবার দেখালুম 'মশাই, মালটা একবার দেখুন তো। যা করতে যাচ্ছি, সবই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। কুকুরের ন্যাজ ধরার মতো। ঘুরে ঘ্যাক।'

দু' নাকে নস্যি ঠুসে ছকের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। নস্যির গুঁড়ো পড়ল জন্মকুণ্ডলীর ওপর। নস্যিমার্কা বরাত। যে নাকেই ঢুকবো, সে ব্যাটাই হেঁচে মরবে। অজিতবাবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মঙ্গলটাকে একেবারে ড্যামেজ করে দিয়েছে হে। এ মঙ্গলে তো মঙ্গল হবে না। চারপাশে শত্রু একেবারে গিজগিজ করবে। আগুন, রক্ত, কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, ছিঁড়ে

যাওয়া। ধরো তুমি কোনও বড় বাড়ির তলা দিয়ে যাচ্ছ, তোমার মাথায় থান ইঁট বা ফুলগাছের টব পড়ার সম্ভাবনা একশো ভাগের মধ্যে নব্বই ভাগ। মুণ্ডুটাকে সাবধানে রাখাই সমস্যা। একবারও ফেটেছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'ফাটবে। তোমাব মাথা নয় তো বেল। গোটা সাতেক স্টিচ পড়বেই। যত তাড়াতাড়ি পাবো সাবধানে ফাটিয়ে ফেল।'

'নিজে নিজে ফাটাবো ?'

'হ্যাঁ অ্যাঁ। ফাটবেই যখন, তবু একটা কন্ট্রোল থাকবে। সাতটার জায়গায, একটা কি দুটো স্টিচের ওপব দিয়ে হয়ে যাবে। লাল উত্তপ্ত একটা কিছু পড়বে। যেমন ধবো বিবাট বড বাড়িতে আগুন লেগে মাথায একটা লাল টকটকে বিম ভেঙে পডল!

'টিউব লাইট ভেঙে পডতে পাবে ?'

'সে তো তোমার গিয়ে কমের ওপর দিয়ে হল। অত কমে কি হবে। খারাপ মঙ্গল, তায় আবার পাওয়ারফুল। কেলেঙ্কাবি কাণ্ড। লাল থেকে খুব সাবধান।'

'লাল শাড়ি ?'

'ওবে বাপরে! ছুবি চালাতে বাধ্য করবে।'

'মানে ?'

'মানে ধরো, লাল শাড়ি পরা একটা মেয়ের জন্যে দিলে রাইভ্যালের গলায় ছুবি চালিযে।'

'আমাব বিয়েটা কি নর্মাল হবে ?'

'নর্মাল ? জেনে বাখ তোমার জীবনে কোনও কিছু স্বাভাবিকভাবে হবে না। আমাব বউযেব মতো, একটা ডেলিভাবিও নর্মাল নয়, আর একটাও বাঁচল না। দ্যাখো না, আধপাগলি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আবাব বৈষ্ণবী হয়েছেন। হাততালি দিয়ে দুলে দুলে যখন নাচেন, হরে কৃষ্ণ হবে বাম, মনে হয় সাক্ষাৎ মীরাবাঈ। আমি মাইরি একটা জাত তান্ত্রিক, পঞ্চমকাব ছাড়া আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খোলে না ; আমার খাদ্য হয়েছে, কুমডো ভাতে, ঢ্যাঁডস ভাতে, ডাল ভাতে, আলু ভাতে।'

'আপনার কোন গ্রহটা গড়বড ?'

'শুক্র। শুক্রটা ড্যামেজ হয়ে আছে। তবে তোমাব বিয়ে না করাই ভালো। বউ অ্যাবনরমাল হবে। শেষটায় সামলাতে পারবে না। রাস্তায় রাস্তায ঘুবতে হবে।'

'আমি কি শেষটায় সাধু হয়ে যাবো ?'

'কোনও চানস নেই। তবে তোমাকে বোঝা শক্ত হবে। সাধুরা ভাববে সাধু, চোরেরা ভাববে চোর। তোমার যা কোষ্ঠী তাতে তোমার কিছু না করাই ভালো। যা করতে যাবে সব গেঁজে যাবে। পাততে গেলে দই হয়ে গেল ছানা।'

'তাহলে সারাজীবন আমি কববোটা কি ?'

'তোমার কোষ্ঠীতে খুব উচ্চাঙ্গের গৃহভৃত্য হবার যোগ ছিল। কোলে পিঠে করে বাবুদের ছেলে মানুষ করবে। বাজার দোকান করবে। জুতো পালিশ করবে। গিন্নিমায়ের ফাইফরমাশ খাটবে। সে তো আর হবার উপায় নেই। এখন ওই দালালি করবে। তোমাব পয়সা হবে লোক ঠকিয়ে। দু' একবার জেলটেলও হতে পারে।'

'তার মানে আমি চোর হবো ?'

'চোব নয জোচ্চোর।'

'সাংঘাতিক কোষ্ঠী তো। কি করে এমন হল ?'

'ওই যে লগ্ন ! লগ্ন-সন্ধিতে জন্মে মরেছ।'

'আমার গান হবে ?'

'ক্ল্যাসিক্যাল নয। বাঈজি বাড়ির গান।'

'জ্যোতিষ হবে ?'

'হতে পারে, তবে বিচারে ভুল করবে। রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট ধাপ্পা মারবে।'

'নেতা হতে পারবো ? পলিটিকস্ ?'

'পলিটিকস হতে পারে ; কারণ তোমার বোধবুদ্ধি তো খুবই কম। আব ধান্দাবাজ টাইপের। গোলে হরিবোল দিতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

কোষ্ঠীটা গোল করে রোল করে আবার যথাস্থানে তুলে রাখতে রাখতে অজিতবাবুকে মনে মনে গালাগাল দিলুম, ধাপ্পাবাজ। একটা কোষ্ঠীর কোনও কিছু ভালো নয় এমন হতে পারে ! আমাকে ভড়কে দেবার জন্যে যা খুশি তাই বলে গেলেন। যাক একটা ভালো হল, আমি কয়েকটা জিনিস শিখে গেলুম, লগ্ন, অষ্টম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, বক্রী। ওই জ্ঞানটাকে খানিক ফলাও কবতে পারলেই আমিও জ্যোতিষী। বেশিরভাগটাই তো কল্পনা।

পার্বতীকে আচ্ছা করে স্যালাইন ট্যালাইন দিয়ে পেট আর পিঠ এক করে ছেড়ে দিলে। আমার ওপর ভার পড়ল।

পার্বতীর মা-বাবা দু'জনেই একটু ক্যালাস টাইপের। দু'জনেই দু'জনকে নিয়ে ব্যস্ত। একজন ব্যবসা নিয়ে, আর একজন তাঁর নিজের লক্ষগণ্ডা অসুখ নিয়ে।

আর প্রতিটি অসুখই এক একটা জায়গায় না গেলে সারবে না। হজমের জন্যে রাজমহল। মাথাধরার জন্যে মুসৌরী। শ্বাসকষ্টের জন্যে পুরী, বাতের জন্যে রাজগীর। চুল ওঠা বন্ধেব জন্যে কন্যাকুমারী। মোটা হবার ভাব আসছে মাউন্ট আবু। কেউ কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না বলে, যমের বাড়ি। মহিলা সারাদিন গজর গজর করছেন। যত গজরগজর করছেন জীবন লোভ দেখাবার জন্যে বৈভব তত ঢেলে দিচ্ছে। পার্বতীর বাবা একেবারে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন ; মাথামুণ্ডু নেই। বাড়িটা তো মালপত্রে বোঝাই হয়ে গেল। এত জিনিস যে হিসেবেব বালাই নেই। সাত দেওযালে সাতটা ঘড়ি। খাট, ডিভান, সোফাসেট, চেয়ার, টেবিল। যে মেয়েছেলেটি ঘরদোর মোছে তার গজগজানি। একবার এটায় মাথা ঠোকে তো, একবার ওটায়। মাঝে-মাঝে পার্বতীর মায়ের দুঃখ শোনা যায়—জিনিসে জিনিসে এবার আমি পাগল হয়ে যাবো। পা-ফেলার জায়গা নেই গো।

পার্বতী রোগা হয়ে গেছে। গাড়িতে বেচারা সোজা হয়ে বসতে পারছে না। মাঝে মাঝেই মাথাটা আমার কাঁধের ওপর ফেলে দিচ্ছে। কলকাতা এখনও স্বাভাবিক হয়নি। বাতাসে বারুদের গন্ধ। স্কুল কলেজ সব সরকারী নির্দেশে বন্ধই আছে। বন্ধের দিন আর তারপরের দিন ভয়ানক সব কাণ্ড হয়ে গেছে। আগুন, আক্রমণ, গুলি, মৃত্যু। আমাব কোনও রাজনীতি নেই ; তবু শাসকদলের ওপর ভয়ঙ্কর একটা ঘৃণা এসে গেছে। আবার বামমার্গী হতে গিয়ে সেদিন প্রচণ্ড ধোলাই খেয়েছি।

পার্বতী বললে, 'ওই মোড়ে ট্যাক্সিটা একটু সাইডে রাখতে বলো।'

'কি করবে ? শরীর খারাপ লাগছে ?'

'না শরীর ফিট। খালি যা একটু দুর্বল। তুমি আর আমি দু'জনে ওই ইমেজ বলে দোকানটা থেকে একটা ছবি তুলবো।'

'ছবি ? আজ ছবি তুলবে ? এই শরীরে। পরে হবে।'

'আমার কোনও কাজে বাধা দেবে না। আমি একটু একগুঁয়ে আছি জানোই তো।'

'আমার সঙ্গে ছবি তুলবে ? কেন ?'

'বেশ করবো।'

স্টুডিও ইমেজের ছোকরা ফটোগ্রাফার পার্বতীকে চেনে। আগে মনে হয় নাচের ছবিফবি তুলেছে। ক্যামেরায় ফিল্ম চাপাতে চাপাতে বললে, 'দিদি, আপনি একটু রোগা হয়ে গেছেন।'

'তাতে কি ছবি তোলার অসুবিধে হবে ?'

ছেলেটি কেঠো উত্তর শুনে ঘাবড়ে গেল। ক্যামেরা ঠিকঠাক করে চাবপাশে আলো জ্বালিযে বললে, 'চুলে একটু চিরুনি চালালে হত না ?'

'না, যেমন আছে সেইরকম।'

ছবি তোলা হয়ে গেল। পার্বতী প্রায আমার বুকের কাছে। আমি তার দুটো কাঁধ ধবে আছি। স্বামী স্ত্রী বিয়ের পর ভালোবাসার প্রগাঢ় মুহূর্তে যেমন ছবি তোলায় আর কি ! ছবিটা এখনও আছে। সময়ের হিসেব। ছবিটা দেখলেই বিশ, একুশ বছর পিছিয়ে যাই। তিনটে ফুলসাইজ কপি হযেছিল। একটা পার্বতীদের বাড়িতে ছিল। একটা আমাদের কাছে। আর একটা পার্বতীর এক বান্ধবী নিয়ে গেছে। ছবিটায় পার্বতীকে দেখাচ্ছে, যেন হাঁটাপথে বাবা তারকেশ্ববেব মাথায় এইমাত্র জল ঢেলে ফিবছে। আর আমাকে দেখাচ্ছে বঙ্গে বর্গীর মতো। পার্বতীকে জিজ্ঞেস কবেছিলুম, 'তোমাব হঠাৎ এত ভালোবাসা হল কেন ?' তিরিক্ষি উত্তর, 'ন্যাকার মতো কথা বোলো না।' সেইদিনই পার্বতী, তুমিতে নেমে এসেছে। আর ন্যাকা বিশেষণটা সেই থেকে লেগে আছে আমার আগে।

পার্বতীর মা বললেন, 'এই মেয়েকে আবার নাচাতে হলে গেঁড়ি চাই।'

'গেঁড়ি ?'

'হ্যাঁ, সিঙ্গি, মাগুরে হবে না। গেঁডিব ঝোল দিতে হবে।'

'গেঁড়ি তো পুকুরে হয়। পুকুর আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?'

'মাছও তো পুকুবে হয়। মানিকতলাবাজাবে সব পাওযা যায়।'

অজিতবাবু বলেছিলেন, ভালো গৃহভৃত্য হবার যোগ আছে। ট্রামে যেতে যেতে ভাবছি, এটা ঠিক ভৃত্যগিরি নয়। প্রেমের ফ্যাঁকড়া। লুকোচুবি না থাকলে প্রেম হয় না। তবু একে আমি প্রেমই বলবো। ট্রামে সেদিনের একটা খবর নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে, প্রফুল্ল সেন পদত্যাগ কবতে চেয়েছিলেন। অতুল্য ঘোষ চেয়াবে চেপে বসিযে রেখেছেন। ট্রামের আলোচনা থেকেই বুঝলুম সাধারণ মানুষের ঘৃণা কোথায় উঠেছে। পারলে আজই সবকার ফেলে দেয়।

মানিকতলা বাজারে আগে কখনও আসিনি। এমন একটা জিনিস কিনতে এসেছি যা মুখ ফুটে কারোকে বলতেও পারছি না। শেষে এক বৃদ্ধ মাছঅলাকে জিজ্ঞেস করলুম। বৃদ্ধের মেজাজটি ভালো। হাসতে হাসতে বললে, 'ওসব ইসপেসাল জিনিস। দেখছেন তো বাজারের অবস্থা। আন্দোলনেব জন্যে মালপত্র আসছেই না। এই কিছু ফ্যাঁসা মাছ পড়ে আছে, নিয়ে যাবেন তো নিয়ে

যান। এরপর তাও পাবেন না।'

গেঁড়ি আমাকে পেতেই হবে। ভালোবাসা পেলে মানুষ বিপ্লবী হয়ে ওঠে। ঠেল মাবতে মারতে পৌঁছে গেলুম দমদম বাজারে। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। সেখানে এক মহিলার কাছ থেকে গেঁড়ি পেয়ে গেলুম। আসতে আসতে ভাবছি, রোজ কি সম্ভব হবে?

দুপুরবেলা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ধর্মগুরুদেব মতো চোখেব সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। আশ্রম, মন্দির, আরতি। বাঘছালের ওপর বসে আছি ধ্যানস্থ হয়ে। তপ্তকাঞ্চনেব মতো চেহারা হয়েছে আমার। আমার সামনে হাতজোড় করে যাঁরা বসে আছেন, তাঁবা সব কলকাতাব বাঘাবাঘা লোক। কেউ মাথা কাটতে পারেন। কেউ চাকরি দিতে পাবেন। বড় ডাক্তার। বড় উকিল। আমাব সামনেব দেওয়ালে একটা সোনার টিকটিকি স্থির হয়ে আছে।

চটকাটা ভেঙে গেল। বুঝলুম প্রভুপাদ ডাকছেন। আমার সময় হয়েছে। রোজ সকালে গেঁড়ির জন্যে বাজাবে বাজারে ঘোরার চেয়ে নালিকুল চলে যাওয়াই ভালো। ওখানে তবু ফিউচার আছে। গীতাটা বার কতক পড়ে নেবো আর খান তিনেক উপনিষদ। চাবটে উপদেশই তো দেবাব মতো আছে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম প্রেম। ছোট একটা ভুঁড়ি চাই। সে হয়ে যাবে। ছানাটানা খেলেই হবে।

নালিকুলে যখন পৌঁছলুম বাত হয়ে গেছে। 'প্রভুপাদের' আশ্রম বলতেই বিকশা ফনফন ছুটলো। দূব থেকেই শুনতে পাচ্ছি খুব নামসংকীর্তন হচ্ছে। খাঁইখাঁচা কঞ্জাল বাজছে। সংকীর্তন শুনে তেমন ভক্তিব উদয হচ্ছে না। এইটাই দুঃখের কথা। মনে হয় আমার স্বভাবটা খুব চাপা। সহজে কিছু ফুটে বেরোতে চায় না। যেমন ছোটদেব হাম। একটা টাইপ আছে ভেতরে বসে যায়। সেটা খুব মারাত্মক। আমার হল বসাভাব। সাংঘাতিক জিনিস। পুলিসের কম্বল ধোলাইয়ের মতো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গাঁটে গাঁটে খুলে যায়। আশ্রমেব গেটে নামিযে দিযে রিকশা চলে গেল।

ঢুকেই বিশাল একটা বকুল গাছ। গোল হয়ে আছে। বাঁধানো বেদী। সেখানে কেউ নেই। একটা সাইকেল হেলানো। কিছুদূরে একটা মটোব বাইক। আরও কিছুটা হেঁটে যাবাব পব নাটমন্দিব। নাটমন্দিরে কুড়ি পঁচিশজন নাবীপুরুষ বসে নামগান কবছেন। একটু বেসুরো হচ্ছে। তা হোক। আমি তো এসেই গেছি। তালিম দিয়ে ঠিক করে নেবো। বেসুরো ভক্তির চেয়ে, সুরে ভক্তি হওয়াই উচিত। একপাশে একটা ডেস্ক, তার পেছনে আসন। ফুলের মালা।

কথকতা হচ্ছিল মনে হয়। নাটমন্দিরের সামনে মন্দিব। শ্রীকৃষ্ণ হাসছেন। ঠোঁটেব কোণে বাঁশিটি ধবেছেন কি ধরেননি। পাশে শ্রীরাধিকা। নাটমন্দিবে বসেই মূর্তি চোখে পড়ে। অপূর্ব সাজানো। একটু আগে গা ছমছম করছিল। মনে হচ্ছিল, এখানে অন্যরকম একটা কিছু ব্যাপার আছে। রহস্যময়। সেই ভাবটা ক্রমশ কাটছে। হাঁ কবে দাঁড়িয়ে আছি বেশ কিছুক্ষণ। কোথায় আমার প্রভুপাদ! তিনি কি একটু পবে ওই পাঠেব আসনে এসে বসবেন! সামনে ডেস্ক, মালা। ধূপদানিতে চারপাঁচটা ধূপ গোঁজা।

দূবে একটা লম্বাটে দোতলা বাড়ি। সেই দিকে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি, দেখি উলটো দিক থেকে এক সন্ন্যাসী আসছেন। বড বড চুল। দাড়ি বেশ দীর্ঘকায়। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালুম। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস কবলেন, 'কি হলো?'

'কিছু তো হয়নি।'

'এদিকে কোথায়?'

'আমি প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা কববো।'

'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'প্রভুপাদই আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'তিনি নেই, অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবতে গেছেন।'

'সনাতন ব্রহ্মচারী?'

'সনাতন ব্রহ্মচারী নয়, বেদ চৈতন্য। তিনিও গেছেন।'

'এই রে আমি তাহলে কি কববো?'

'কি আর করবে বাছা, তিন মাস পবে এস।'

'রাতটা দযা কবে থাকতে দিন।'

'বাইবেব কারুর রাতে আশ্রমে থাকার নিযম নেই।'

'এত রাতে তো কলকাতা ফেরা যাবে না।'

'বাজারেব কাছে হোটেল আছে।'

নির্জন পথঘাট। শুধু মানুষ নয় বাড়িগুলোও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অচেনা জায়গা। হাঁটছি। আমার সেই জ্যোতিষী অজিতবাবুর কথা মনে পড়ছে। কোনওটাই আমার নর্মাল নয়। দুপুববেলা বেশ বসেছিলুম বাড়িতে আয়েস করে। কি দরকার ছিল মরতে এখানে আসাব! এমন অভদ্র আশ্রমও দেখিনি।

ধর্মে মানুষের মতিগতি ওইজন্যেই চলে যায়।

বাজারের কাছে ছ্যাঁচা বেড়া, দবমামরমা লাগানো একটা আস্তানা। তার নাম মহালক্ষ্মী হোটেল। মালিক বললেন এখানে ঘর তো ভাড়া পাওয়া যায় না। চৌকি পাওয়া যায়। আপনাদেব মতো ভদ্রলোক কি থাকতে পারবে? ভদ্রলোকেব সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। কলকাতার কথা, আন্দোলনের কথা, মিলিটারির গুলি চালানোব কথা, আমাব জামাব বুকে ঘিলু লেগে থাকার কথা যত বলছি, ততই ভদ্রলোকেব গল্প শোনাব উৎসাহ বাড়ছে। বিশেষ লোকজন নেই। রাত হযে গেছে। ভদ্রলোক যত শুনছেন ততই বলছেন, 'উঃ দেশটার কি অবস্থা করলে। পাঁচ ভূতে দেশটাকে শেষ কবে দিলে।'

শেষে প্রশ্ন কবলেন, 'কি করতে এসেছিলেন এখানে?'

'প্রভুপাদেব আশ্রমে। আমাকে চিঠি লিখেছিলেন আসার জন্যে। এসে শুনছি তিনি বিদেশে চলে গেছেন। আমাকে দূর কবে তাড়িযে দিলে।'

'ওই আশ্রমে এসেছিলেন! সর্বনাশ। ও তো সাংঘাতিক জায়গা। প্রভুপাদ বিদেশে গেছেন, না জ্যান্ত সমাধি দিযে দিয়েছে? আমাব এখানে তো অনেকে আসে। এক মিস্ত্রী বলছিল, ওখানে মাটিব তলায় ঘর আছে। সেই ঘর থেকে অনেক কঙ্কাল বেবোবে।'

'প্রভুপাদই তো সব, তাঁকে মেবে ফেললে আশ্রম তো উঠে যাবে!'

'যাক না। টাকা পয়সা যা করার অনেক করে নিয়েছে। ওখানে ওই বেদ চৈতন্য বলে একজন আছে, সে হল সনাতন ডাকাত। জানেন তো, ওঝার মৃত্যু হয ভূতেব হাতে। ওসব জাযগায কক্ষনো যাবেন না। ধর্মকর্ম সব বাড়িতে বসে কববেন। ভগবান কি ইনসিওরেন্স যে এজেন্ট ধরতে হবে?'

ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনই জমে গেল, দবমাব হোটেলে চৌকিতে রাত কাটাতে দিলেন না। টানতে টানতে নিযে গেলেন বাড়িতে। সুন্দব চালাবাড়ি। উঠোন, মাচা, চালে চালকুমড়ো গাছ। মাথায কাকতাড়ুয়া। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। নয়নতারা আর কৃষ্ণকলির কেয়ারি। মা, বোন আর বোনের একটি বাচ্চা নিয়ে সংসার। বোনের খুব ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন, জামাই জার্মানিতে গিযে আর একটি বিয়ে করে বসে আছে। লণ্ঠনের আলোয় বোনের রূপ দেখে মাথা ঘুরে গেল। যেন গ্রেটা গার্বো ডুরে শাড়ি পরে নালিকুলের চালাবাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠোঁটের ওপরে ছোট্ট একটা তিল। কোথায় লাগে পার্বতী, নন্দা। লাউশাকের মতো লকলকিয়ে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোকের মা একসময় সুন্দবী ছিলেন। এখন সেই রূপ বয়সে থিতিয়েছে।

নারী হল ঘাট। জীবন হল নৌকো। কোনও এক নারীতে জীবন বাঁধতে নেই। জীবনের মৃত্যু। নৌকোকে ধরাধরি করে তুলে হাটতলায় বসিয়ে দিলে যা হয়। নৌকো ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে যাবে। কখনও লাগবে। কেনাবেচা হবে। আবাব ভেসে পড়বে। অন্য ঘাট, অন্য সওদা।

মেঝেতে মাদুব পাতা।একপাশে একটা খাট। পরিপাটি টানটান বিছানা। বালিশেব থাক। মাদুবে বসে নজবে এলো খাটের তলায় ঝকঝকে একটা হারমোনিয়াম। গলাটা উসখুস করে উঠল। চিরকালই আমার স্বভাবটা হল শস্তা বাহাদুরি নেবার। সুযোগ পেলেই এমন একটা কিছু করা, যাতে সবাই বাহবা বাহবা করে। আইনস্টাইন, বাসেল হবাব ইচ্ছে ছিল। হযতো হতেও পাবতুম। ওই যে পড়তে বসলেই ঘুম, ওই ঘুমেব জন্যে গাছ আর বড় হল না। ভদ্রলোককে বললুম, 'হারমোনিয়াম?'

'অ হারমোনিযাম। আমার বোন চপলা ভালো গান গায়।। কত পদক যে পেয়েছে। আপনি গান করেন বুঝি? শোনান না। এই সবে রান্না চেপেছে। খেতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি তো আছেই।'

ভদ্রলোক হাবমোনিয়ামটা টেনে বের করলেন। আমাব উৎসাহ তখন কমে গেছে। ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোবাতে চেযেছিলুম। ভদ্রলোকের বোন সাংঘাতিক ভালো গান কবেন। আর আমার সাহস নেই, কিন্তু এখন আব আমাব পেছোবার উপায নেই। জয় মা বলে ধরে ফেললুম একখানা। বাণীর জোরে আর সুরেব মাদকতায় গানটা উতবে গেল। গাইতে গাইতে আমার চোখ দিযে জল বেরিয়ে গেল। সুন্দবী মহিলা যৌবনকে দ্বারকায় নিযে গিয়ে ফেলে। সেখানে বাখাল কৃষ্ণেব চিকন গাভীটির মতো মাঠে মাঠে হাম্বা হাম্বা করে মন।

গানটি শেষ হওয়ামাত্র মহিলা এগিয়ে এলেন, 'ভারী সুন্দর। গানটা আমাকে একটু তুলে দেবেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাবা গান তোলাতুলি করুন। আমি পুজোটা সেরে আসি।'

ঘরেব একপাশে কাঠের গরাদ লাগানো পাশাপাশি দুটো জানালা। গাছপালা উঁকি মেরে দেখতে চাইছে, ঘরে কি হচ্ছে। ভিজে ভিজে বাতাস এসে ঢুকছে শান্ত অতিথিব মতো। মেয়েটি একটি খাতা নিয়ে এল। লাল একটা কলম। 'প্রথম লাইনটা লিখুন, যা দিয়েছ, তুমি অনেক দিযেছ, অযাচিত তব দান। পূরবী। প্রথম লাইনটা আগে তুলুন।' অসাধারণ গলা। তুলনাহীন প্রতিভা। পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে। দ্বিতীয়বার গাইতে গিয়ে দেখলুম, আগুন

ছুটছে। মনেব চৌকাঠ-ফৌকাঠ উড়ে গেছে। গলা দিযে যেন গানের লাভা বইছে। মিনিট পাঁচেকেব মধ্যে গান আমাদেব কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দিয়েছে। হাতে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছে। হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিযে দিযেছে। গানেব অন্তবায় পৌঁছে মনে হল, বাসবে জাগছি।

মনেব কিছুটা সেই লক্ষ্মীব সংসারে পড়ে রইল। আমার সেই প্রলাপ খাতায় লিখে বাখলুম, 'এইভাবে মন নামাতে নামাতে তবী একদিন অকূলে ভেসে যায়।' সেই রাত, সেই গান, সেই ঠোঁটে-তিল মেয়েটিব কথা আজও ভুলিনি। জীবনের মস্ত খুঁত, জীবন কেবল এগোতেই জানে, পেছতে পারে না। এমন এক গাড়ি, যার ব্যাক গিযাব নেই। জীবন একটা গ্যালাবি। অনেক ছবি ঝুলিয়ে রেখেছি। আমি এক দর্শক। যখন যেটা ভালো লাগে, সামনে থমকে দাঁড়াই। আলো ফেলি। কেউ জানতে পারে না, কখন কোন ছবিতে আছি।

প্রভুপাদ ভেস্তে গেল। কৃষ্ণসখা পার্থসাবথিব কাছে গেলুম। শেষ চেষ্টা। আমেরিকান কানেকসন বযেছে। কোনওবকমে যদি একবাব ভজাতে পারি? আমেবিকাটা ঘুবে আসতে পাবলে বোলচাল বেড়ে যাবে। খাতির বেড়ে যাবে। আসাব সময কিছু ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিনে আনবো। নামের পিছনে সিঁড়ি ভাঙা ছন্দ। এফ· সি আই। এন এন· সি। ডি টি·এম। ডব্লু· বি· টি। কি তা কে জানে!

লরা দবজা খুলে দিল। আজ আবার একটা শাড়ি পরেছে। চান করেছে। এলো চুল। স্কিনটা দেখার মতো। দার্জিলিং-এর টান টান কমলালেবু। মনকে এক ধমক। গীতা, শ্রীকৃষ্ণ। লবার চুল নয। দেহ দেহত্বক নয়।

'আপনি ভিতবে আসুন। তিনি জ্বব হইয়াছেন।'

'কবে হইয়াছে?'

'আজ হইয়াছে।'

'কি করিতেছেন?'

'শুইয়া আছেন। বই পড়িতেছেন।'

ঘবের দবজাব সামনে দাঁড়াতেই, ভেতব থেকে যেন বাঁশির সুর ভেসে এল, 'এসেছো?'

ভেতরে ঢুকে কার্পেটের ওপর বসে পড়লুম। ডিভানে সাদা একটা চাদর গায়ে তিনি শুয়ে আছেন। হাতে একটা ইংরেজি বই গীতা অ্যান্ড মার্কসিজম। কনুইয়ের ওপর ভর রেখে শরীবটাকে একটু খাড়া করলেন, 'হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেলুম শোভন।'

'হিট ফিভার। যা গরম পড়েছে হঠাৎ।'

'হতে পারে। বহুদিন শুইনি এইভাবে। আজ শুইয়ে দিলেন। শরীর একটা মস্ত বড় পরাধীনতা। তুমি কি ঠিক করলে, সংসার না সন্ন্যাস?'

'কোনটায় সুযোগ বেশি?'

'তার মানে? সংসার তো তুমি দেখছ আর সন্ন্যাস হল ত্যাগ।'

'সন্ন্যাসী হলে সুবিধে হবে? এই ধরুন যশ, খ্যাতি, বিদেশ-ভ্রমণ।'

'আচ্ছা, তুমি আসতে পারো। তোমার মন মলিন হয়েছে। আজ তোমার চোখের দৃষ্টি অন্যরকম দেখছি।'

'আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন? বাঙলা, ইংরেজি, দুটোই আমি মোটামুটি জানি।'

'চাকরি তো আমার কাছে নেই। তুমি ইচ্ছে করলে প্রচারক হতে পার। ইউ ক্যান ভলান্টিয়ার ইওর সার্ভিস।'

'খাবো কি? খাওয়াবো কি?'

'তাঁর কাজ করলে অভাব হয় না।'

মুহূর্তে আমার ভেতর একটা আবেগ এসে গেল। বুকের ভেতর বলড্যান্স হচ্ছে। আইন ব্যবসার পয়সায় ঘরদোর একেবারে ছবি। মেঝেতে পুরু গালচে দেওয়ালে সোনালি রঙ। ঘরের মধ্যে ঘর। দরজায় দরজায় স্বচ্ছ পর্দা। পাশের ঘরে ঝকঝকে মেহগনি টেবিলে, বিদেশী মেয়ে। টেবিলের তলা দিয়ে তার একজোড়া পা দেখতে পাচ্ছি। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। ফর্সা পায়ে লাল স্লিপার আলগা হয়ে বুড়ো আঙুলের মাথায় ঝুলছে। একটা পায়ের অনেকটা ওপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ফর্সা, নরম মোমের মতো। কোথায় কৃষ্ণ ভেতরটা তারবাজির মতো ফেটে যেতে চাইছে। মনটা হঠাৎ যেন পিঁপড়ে হয়ে গেল। পা বেয়ে সুড়সুড় করে উঠছে। মানুষের একটা বয়েস যেন দাঙ্গাহাঙ্গামার বয়েস। মন সেই সময় যেন কুস্তির আখড়ার ঝুরো মাটি। দুই মল্লবীরে পটকাপটকি চলেছে।

ঝট করে উঠে পড়লুম। মহাপুরুষ এখনি আমার মন পড়ে ফেলবেন। 'আমি যাই।'

'কোথায় যাবে? নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবে? বোসো।'

আবার বসে পড়লুম। তিনি ডাকলেন, 'লরা, লরা।'

'আসিতেছি।'

লরা হালকা-পায়ে ঘরে এল। পরনে ফুলছাপ পাতলা শাড়ি। আমি ভয়ে

আর তাকাতে পারছি না। তিনি বললেন, 'লবা এই ছেলেটির পাশে বোসো।'
লরা বসল।

'তুমি ওব কাঁধে হাত রেখে কানে ফিস ফিস করে নাম ঢালো। মুখে গোলাপের গন্ধ আনো।'

আমি ভয়ে আড়ষ্ট। যেন আমাব অপারেশন হচ্ছে। ঠাণ্ডা, ভারী একটা হাত আমাব কাঁধের ওপব দিয়ে ঘুরে বুকের কাছে ঝুলে পড়ল লম্বা লম্বা আঙুল। লবার ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে ঠোঁট আমার ডান কানেব কাছে। সত্যই গোলাপেব গন্ধ। লরা ধীবে ধীরে বলছে, 'কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং, রাম বাঘব, রাম বাঘব রাম রাঘব, রক্ষ মাং।' লরাব দেহকাণ্ড ক্রমশ ভারি হয়ে নেমে আসছে আমাব শরীরে।

কি যে ঘটে গেল সেদিন। পার্থসারথি ডিভান ছেড়ে চলে গেলেন ঘরের আর এক পাশে। সেখানে একটা অবগ্যান ছিল। তিনি অবগ্যান বাজিয়ে গেয়েছিলেন, কৃষ্ণ কেশব। অমন সুর, অমন ভাব, এক বিরল অভিজ্ঞতা। প্রচুর মদ্যপান কবলে যে অবস্থা হয়, আমাব অবস্থা সেইবকম হয়েছিল।

পথে নেমে দেখি সাংঘাতিক অবস্থা। নিমেষে ভাব চটকে গেল। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। নীবব মিছিল। খেয়াল ছিল না, আজ শহীদ দিবস। খাদ্য আন্দোলনে যাঁবা নিহত হয়েছেন, তাঁদের স্মরণে সাবা পশ্চিমবঙ্গ আজ পথে। অত বড মিছিল আগে বা পবে হয়নি। বিভিন্ন বযসেব নারী পুরুষ। পথে মানুষের স্রোত বইছে।

যার আধার তৈরি হযনি, তার মনটাকে ঠেলে ওপরে তুলে দিলে, যখন নেমে আসে একেবারে অতলে তলিয়ে যায়। আমারও সেই অবস্থা হল। ভাবের ঘোরে কিছুটা হাঁটার পবই মনে হল, আমি আর নিজেকে ধবে রাখতে পারছি না। অজগরের শ্বাস আমাকে টানছে। আমি এক ছাগশিশু। এ গলি, সে গলি করতে করতে উষাদের বিখ্যাত পাড়ায়। বিকেল হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশ রক্তবর্ণ, তান্ত্রিক আকাশ। প্রথম দিনের ভয় আর নেই। ছেলে বেশ ডাকো হয়েছে। নানা ধরনের দেহ। দরজায, জানলায়, রকে, পথে। দামী দামী সব পর্দা ফেলা ঘরে। নরম বিছানায়। বালিশের কোলে। সেদিন আমি ছুটেছিলুম আজও মনে আছে। উষার ফ্ল্যাটের কাছাকাছি এসে গেছি। হঠাৎ দেখি পার্বতীর বাবা। কোথা দিয়ে কিভাবে ছুটেছি খেয়াল নেই। মেয়েদের খলখিল হাসি। একজন মনে হয বুঝেছিল, ব্যাপারটা কি! কেন আমি ছুটছি। সে আর একজনকে চিৎকার করে বলছে, 'বাপকে দেখে ছুটছে। বাপকে দেখে

ছুটছে।'

জীবনের ওই সময়টায় বড় দোটানায় পড়ে গিয়েছিলুম। কোন দিকে যাই রোজগাবপাতি নেই। পকেট খালি। অজস্র ধান্দা। সকালে একটা গবেটকে পড়াই। বিকেলে আর একটা। যার জীবনে গান হবে না, এই রকম একট মেয়েকে অ আ করাই। আর সে কেবলই বলে, এইবার একটা গান দিন দুর্গাপুজোর ফাংশনে গাইব। আর আমাদের পাড়ার সেই বিখ্যাত ব্যোমকেশ সাবা বাড়িতে আলোর মালা ঝুলিয়ে চা-বাগানঅলার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল। যৌতুক মটোর গাড়ি।

সেই বিয়ের শোকে তিন রাত আমাদেব বাড়িতে সব ঘুম চলে গেল। থেকে থেকে একটা কথাই শোনা যেতে লাগল, রত্ন, রত্ন। ব্যোমকেশ ইচ্ছে করলে ইংল্যাণ্ডের রাজার মুকুটটাও ছিনিয়ে আনতে পারে। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সেই মেয়েটি থেকে থেকে চোখ কপালে তুলে বলে, চার হাজার টাকা মাইনে পায় গো দিদি, চাব হাজার টাকা।

তার কথা যে শুনছে, সঙ্গে সঙ্গে তাব চোখ উলটে যায়। ওরে জল দে। পাখা বাতাস কর। আমি তখন কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে কোণের ঘরে বসে বসে মশা মারি। আর ভাবি একটা গ্লোরিয়াস আত্মহত্যা করলে কেমন হয়। আর কে পারা যায় না। রোজ রাতে সেই একই গোদা রুটি, ছোলা কুমড়ো। গাঁইগুঁই করবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই এক কথা, রোজগার করো। করে কালিয়া পোলোয়া খাও।

ব্যোমকেশের বিয়ে আমাকে অন্যভাবে ধাক্কা মেরে গেল। রাতে আমি বিছানায় শুলেই মনে হতে লাগল, আমার বাঁপাশ খালি। ব্যোমকেশের বাঁপাশে তুলতুলে একটা বউ। চা বাগানের মেয়ে বাবা! যেমন লিকার, তেমন ফ্লেভার। বিশুকে বললুম, 'আত্মহত্যা করছি।' বিশু ভয় দেখাল, 'ভূত হয়ে ভীষণ কষ্ট পাবি। ফোঁড়ার মতো যন্ত্রণা। তোর জন্যে কেউ গয়ায় পিণ্ডি দেবে না। এ তো শরীরে আছিস, বেশ আছিস। অশরীরীর ক্ষিদে আছে, তৃষ্ণা আছে, প্রেম আছে, কাম আছে, মানুষের মতো সবই আছে, শরীরটা নেই। শরীরের খোসাটা আছে শাঁসটা নেই। আত্মহত্যার অনেক টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে, বুঝলি। তুই কারুর রান্নাঘরে ঢুকে মাছ খেলি। তুই ট্রান্সপেরেন্ট। বাইরে থেকে তোর পেটে মাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। গজ গজ করছে।'

'বাজে বকিসনি। তোর চোখে এরকম পড়েছে কখনও? দু' টুকরো মাছ জল থেকে তিনফুট উঁচুতে ভেসে ভেসে যাচ্ছে।'

'ওই টেকনিক্যাল অসুবিধের জন্যেই তো ভূত কিছু খায় না। এমন কি চুমু পর্যন্ত খেতে পারে না। তুই ভাবছিস ভূত হয়ে তুই সর্বাণী, সোমা, পার্বতী, পারুলকে যখন তখন চুমু খাবি ? পারবি না। দাঁত আর চোয়াল না থাকার ফলে ঠোঁট দুটো তোর খামের মতো জুড়েই থাকবে। খুলতেই পারবি না। আর যাই করিস, আত্মহত্যা করিসনি। দেড় হাজার, দু' হাজার, তিন হাজার বছর ভূত হয়ে শ্যাওড়া গাছে ঝুলে থাকতে হবে।'

'তা হলে করবোটা কি ?'

'আয়, পার্টিতে নাম লেখাই। সামান্য একটু ট্রেনিং নিলেই হয়ে যাবে।'

'কি ট্রেনিং নিতে হবে ?'

'প্রথম হল, বাস জ্বালানো। দু'রকম বাস। ডবল ডেকার আর সিঙ্গল ডেকার। ট্রাম জ্বালানো। ট্রেন জ্বালানো। চেয়ার টেবিল ভাঙা। পাখার ব্লেড দোমড়ানো মোচড়ানো। ট্রাম লাইন ওপড়ানো। টেলিফোনের তার ছেঁড়া। বোম টপকানো। পোস্টার লেখা।'

'ওব কোনওটাই আমার দ্বারা হবে না।'

'যাঃ, এ খুব সহজ কাজ। সবাই পারছে, তুই পারবি না !'

'আমি পার্টির মাথার দিকে থাকতে চাই। কালচারাল সাইডে।'

'তুই অবশ্য গান গাইতে পারিস। তাহলে ওই গানটা খুব প্র্যাকটিস কর, শপথ করো ভাই শপথ করো।'

হঠাৎ দুপুরবেলা একটা টেলিগ্রাম এলো। সবাই ভাবলে কেউ বোধহয় টেঁসে গেছে। টাঁসাটাঁসি নয়, সেই বুলার কোম্পানি, যেখানে ইন্টারভিউ দিয়েছিলুম তাদের জরুরী তলব। বাড়ির আবহাওয়া নিমেষে বদলে গেল। দুপুরে আমার জন্যে আলাদা করে বেগুন ভাজা হল। মা একটা কাচা চাদর নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে বললে, ঘরটার কি অবস্থা করে রেখেছিস ! কেউ দেখলে ভাববে, ছেলেটার মা মারা গেছে ! বিছানার চাদরটা, বালিশের ওয়াড়টা বের করে দিতে পারিস তো। সব আমাকে বলতে হবে ! জানিসই তো, আমি সাত কাজে ব্যস্ত থাকি।'

মনে মনে হাসলুম। গরু গাভিন হয়েছে। এইবার দুধ আসবে। ভালো করে খইল, ভুসি আর ভেলি খাওয়াও। সংসার। এই সব খবর খড়ের গাদায় আগুনের মতো ছড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে মোটা, রোগা, দোহারা, পাতলা, বিভিন্ন ধরনের আত্মীয়স্বজনেরা আসতে আরম্ভ করলেন। কেউ এলেন কাশতে কাশতে। কাশিরই কত রকমফের। কেউ কাশেন খুক খুক। কেউ কাশেন খ্যাঁক খ্যাঁক। কারুর আবার নিজের কাশির ওপর এত বিরক্তি, গুছিয়ে কাশার

ধৈর্যটুকুও নেই। ফেলে ছড়িয়ে ছত্রাকার কাশি। কারুর সর্দি। অনবরত নাক টেনে চলেছেন। মাঝে মাঝে নাকের ওপর হাতের চেটো ফেলে ডলছেন আর মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করছেন। কেউ পালিশ করা চেয়ারের ওপর গোদা পা তুলে বসেছেন, আব টেবিলের ওপর কনুই রেখেছেন। টেবিলক্লথ গুটিয়ে গেছে। বইয়ের থাক ধসকে গেছে। কেউ সোফায় বসে খালি চেয়াবে ঠ্যাং তুলে দিয়েছেন। চেয়ারটাকে পাযেব কসরতে পেছনে হেলাচ্ছেন আবাব সোজা কবছেন। ঘরে যেন গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের মহলা চলেছে। এক প্রবীণা এসেছেন কোলে নাতিকে নিয়ে। সে যত ঘ্যান ঘ্যান করে প্রবীণা ততই কুকুব আব বেডাল ডেকে তাকে ভোলাতে চান।

অসহ্য হযে একসময় উঠে পালাতে চাইলুম। আমার দূর সম্পর্কেব এক কাকা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন, 'আরে বোসো বোসো, পালাচ্ছ কোথায। তুমি তো আজ আমাদেব হিবো। কামাল কবে দিয়েছো। টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠিযেছে, ভাবা যায়। চাকবি তো অনেকেই পায, টেলিগ্রামে চাকরি ক'জনে পায হে! কেউ না, এই আমিই তোমাকে বলেছিলুম, শোভন তোমার ভাগ্য একদিন ফিববে। এমন ফেরা ফিববে যে, নিজেকেই নিজে চিনতে পারবে না। কি বলিনি তোমাকে।'

ভদ্রলোক কথা শেষ কবে আচমকা পিঠে একটা থাপ্পড মাবলেন। হাত নয তো হাতুডি।

নাতি কোলে প্রবীণা তিনবার ঘেউ ঘেউ করে বললেন, 'এখন কতো মাইনে দেবে, মিযাও।'

'মাইনেব কথা লেখেনি।'

'ঘেউ, ওমা সে আবাব কি! ঘেউ ঘেউ! আমার ছেলে ব্যাঙ্কে মিযাও, চাকবি পেল ঘেউ ঘেউ, পষ্ট লেখা ছিল সাতশো ঘেউউ টাকা মাইনে দেবে।'

আর একজন সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'এটা তাহলে মনে হয় চাকবি নয়। টেলিগ্রাম তো, তাব মানে চাকরির মৃত্যুসংবাদ।'

এই সময় একজন হাঁচতে শুরু করলেন। হাঁচির পর হাঁচি। শব্দ কি, যেন বোমা ফাটছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন উপদেশ দিলেন, 'ডান বগলে কাতুকুতু দাও, কাতুকুতু। এক্ষুনি থেমে যাবে।'

আব একজন বললেন, 'পেট গরম, পেট গরম। সকালে কতিলা খাও।'

আব একজন বললেন, 'পেট গবম নয়, পেট পরিষ্কার হচ্ছে না, পাকা বেল খাও তিনদিন।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বললেন, 'বেল না, বেল না। বেল খেলে পেটের বাঁধুনি আলগা হয়ে যাবে। ইসবগুলের ভুসি খাও। ইসবগুলের ভুসি।'

যিনি হাঁচছিলেন, তাঁর হাঁচি থামল। তিনি বললেন, 'না না, ওসব কিছু নয়, ঘরে নস্যি উড়ছে।'

আমার সেই কাকা, কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'তোমাকে আমার একটি কথা বলার আছে বাবা, ওই রাধিকাটিকে বিয়ে কোরো না। ফ্যামিলিটা ভালো নয়। শুধু পয়সা থাকলে হয় না, কালচারেরও প্রয়োজন আছে। ওরা সব ভালচার। ভাগাড়ের দিকে নজর কেবল।'

মাথা নিচু করে বসে আছি। বিয়ে কোরো না। মনে মনে বিয়ে তো করেই বসে আছি।

বুলার কোম্পানির বাটালিওয়ালা কেন জানি না খুব খাতির করলেন। ঘোরা চেয়ারে বসে, একবার ওদিকে ঘোরেন, একবার এদিকে ঘোরেন। প্রথম দিনের সাহস আর আমার নেই। মনে গৃহভৃত্যের ভাব এসে গেছে। কাঁচুমাচু মুখের চেহারা। বাটালিওয়ালা এখন আমার প্রভু।

বাটালিওয়ালা বললেন, 'তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে বুঝলে।'

ইংরেজিতে কথা হচ্ছে। ইউ, ইউ বলছেন। নিশ্চয় আপনি করে বলছেন না। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে। ঠোঁটে পাইপ ঠুসে বললেন, 'তুমি তো কিছুই জানো না, কিন্তু তুমি বেশ ওস্তাদ। আমরা একজন ওস্তাদই খুঁজছি। ফর এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব। রিস্ক আছে। অ্যাডভেঞ্চার আছে।'

কি রে বাবা, পাহাড়ে চড়তে বলবে না তো! কিম্বা গভীর সমুদ্রে ডাইভিং! নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাজটা কি স্যার?'

'সিম্পলি চোর ধরা। আন্দামানে আমাদের একটা বিরাট এসট্যাবলিশমেন্ট আছে। কাঠ। কাঠের কারবার। প্যাডক আছে। মেহগনি আছে। দেশলাই কাঠ, যাকে বলে ম্যাচ উড। আন্দামান হল কাঠ আর নারকোলের স্বর্গ। তোমাকে সেইখানে যেতে হবে।'

'আন্দামানে স্যার?'

কেমন অনায়াসে স্যার বেরিয়ে এল! নিজেই অবাক। একটা দাস কেমন নিমেষে জন্মায় বাদুলে পোকার মতো!

'ইয়েস আন্দামান। কেন ভয় করছে? তুমি তো এখনও বিয়ে করোনি! আন্দামানে গেলে তুমি কলকাতার চেয়ে বেশি মাইনে পাবে। আউটস্টেশান

অ্যালাওয়েনস্। ওখানে অলরেডি আমাদের একজন ম্যানেজার আছে। সে চুরি করে সব ফাঁক করে দিলে। তোমাকে পাঠানো হচ্ছে ডেপুটি ম্যানেজার করে। উদ্দেশ্য, তোমাকেই আমরা ম্যানেজার করবো, উইদিন সিক্স মান্থস্। তখন তুমি একটা সুন্দর বাংলো পাবে। একটা গাড়ি পাবে। বছরে একবার মেনল্যান্ডে আসার টু অ্যান্ড ফ্রো এয়ার প্যাসেজ পাবে। হেলদি প্লেস। প্রচুর খাওয়া। একটাই সমস্যা, বছরে দুবার মনসুন। কিন্তু ভেরি চার্মিং অ্যান্ড রোম্যান্টিক প্লেস। চারপাশে সমুদ্র। চার্মিং আইল্যান্ডস চারপাশে ভাসছে। আমাদের একটা ছোট জাহাজ আছে। মাঝে মাঝে তুমি এ দ্বীপে ও দ্বীপে বেড়াতে পারবে। ইউ ক্যান গো টু কার-নিকোবর অলসো। ফেয়ারি আইল্যান্ড উইথ এ ফেয়ারি বিচ। তোমাকে এখন আমরা দু'হাজাব টাকা মাইনে দেবো।'

আমার গলার কাছে একটা গোলা আটকে গেল। ভদ্রলোক বলেন কি! দু'হাজাব টাকা মাইনে! মাথার ঠিক আছে তো। মনে হল, আমি কেঁদে ফেলবো। ইচ্ছে কবছে মুখ থুবড়ে ভদ্রলোকের বুটজুতোর ওপর পড়ে যাই। পড়ে পড়ে গান গাই, তুঁহি হো মাতা, পিতা তুঁহি হো। বাটালিওযালা ঠোঁট থেকে পাইপটা টেনে বের কবলেন। পাইপের ঠোঁটটা চকচকে রুপো বাঁধানো। বেশ একটা অথরিটি আছে। পাইপটাকে কাঁচের অ্যাশট্রের ওপর পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রেখে দু'হাতের ফর্সা ফর্সা সুন্দর আঙুল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি? এগ্রিড?'

'ইয়েস স্যার।'

আমার গাল বেয়ে কি একটা গড়িয়ে এল! আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলুম। এই সর্বনাশ! জল! আবেগে কেঁদে ফেলেছি। দুঃখেব বা ত্যাগেব নাটক বা সিনেমা দেখলে যেবকম হয়। চোখের জল আপনি গড়িয়ে পড়ে। ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডে নিজেব ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ভাঙা সাবেকি বাড়িটা নতুন হয়ে গেছে। মাকে গরদের শাড়ি পরিয়েছি। ভিটামিন আর টনিক খাইয়ে চেহারাটাকে উজ্জ্বল করিয়েছি, একসময় যেমন ছিল। বাবার উঞ্ছবৃত্তি বন্ধ করিয়েছি। দুঃখের অন্ধকার সংসারে ধীরে ধীরে ভোরের সূর্যের মতো আলো ফুটছে। দশটা মিস্ত্রি নোনা ধরা দেওয়ালে পোঁছের পর পোঁছ রঙ মারছে। ফিকে গোলাপী রঙে সোনালি বর্ডার।

বাটালিওয়ালা বললেন, 'তোমার চোখে জল কেন?'

'ইমোশান স্যার।'

'আই সি, আই সি। আর ইউ অনেস্ট?'

'কখনও চুরি করার সুযোগ পাইনি।'

'আর ইউ এ ফাইটার ?'

'অভাবের সঙ্গে ফাইট করেছি।'

'আর ইউ কালচারড ?'

'আনকালচারড হবার মতো পয়সা ছিল না।'

'ডু ইউ ড্রিম অফ ইওর ফিউচার ?'

'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডাই।'

'দ্যাটস বাইট। তোমাকে আমি এইজন্যেই ভালোবেসে ফেলেছি। ওয়েটিং রুমে বোসো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে যাও। পরশুদিন আসবে। তোমার এয়ার টিকেট, অ্যাডভান্স কিছু টাকা নিয়ে যাবে। সোমবার ভোরে তোমার প্লেন।'

এক ঘণ্টা পরে আমি কলকাতার পথে। পকেটে আমার চাকরির চিঠি। অন্য দিন বেপরোয়া রাস্তা পার হই। সেদিন কত সাবধান। এক ঘণ্টার এদিক-ওদিক, জীবনের দাম হঠাৎ কিরকম বেড়ে গেল। অন্য দিন ছোলা সেদ্ধ কিনে খাই। সেদিন আর সাহস হল না। যদি কলেরা হয়ে যায় ! যে কোনও লোককে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে, 'মশাই, দু'হাজার টাকা।' পাঁচশো টাকা খরচ করবো, দেড় হাজার বাড়িতে পাঠাব। আঃ, সারাজীবন আমার বাবা অনেক কষ্ট করেছেন। আর না। আমি কি তাহলে বড়লোক হয়ে গেলুম। নিজের সাবধানতা দেখে মনে হচ্ছে, বড়লোকদের মরতে খুব কষ্ট হয়।

সন্ধেবেলা, আবার আত্মীয় স্বজনদের সমাবেশ। হাঁচি, কাশি, ট্যাঁ ভ্যাঁ। আমার সেই কাকা বললেন, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আমাকে একবার দেখাও, শূন্যটূন্যগুলো ঠিক আছে কি না দেখি। তোমার কোয়ালিফিকেশানের ছেলেকে মাসে দু'হাজার ! বিশ্বাস হয় না। সামহোয়্যার সামথিং রং।'

চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখলেন। ঘরের অন্যান্য সকলের কি উৎকণ্ঠা ! এখুনি যেন মকদ্দমার রায় বেরোবে। তিনি চোখ তুলে সকলের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকটি মুখ আলাদা করে দেখলেন। তারপর বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে বললেন, 'নাঃ, দু'হাজারই লিখেছে।'

নাতি কোলে প্রবীণা বললেন, 'উঃ, টাকা একেবারে ঢেলে দিয়েছে। কি আপিস কে জানে বাবা !'

আমার সেই কাকার মুখে হঠাৎ একটু হাসি ফুটল। ভোরের আলোর মতো। কিছু যেন একটা খুঁজে পেয়েছেন। একটা হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে

বললেন, 'আমি ধরতে পেরেছি। রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। আন্দামানের টাকা আর ভারতের টাকায় অনেক তফাত। আন্দামানের টাকার দাম ভারতের টাকার অর্ধেক। ওখানকার দু'হাজার মানে এখানকার এক হাজার।'

ঘরে গুঞ্জন উঠল, 'তাই বলো। যাক বাবা, একটা দুশ্চিন্তা কাটল।'

বাবা আবার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন, 'কে তোমাকে এই আজগুবি খবরটা দিলে। ভারতের টাকা আর আন্দামানের টাকা এক। সমান দাম।'

কাকা দমে যাবার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'তাহলে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। আমি শুনেছি আলুর কিলো দশ টাকা। চালও দশ টাকা। সেই তুলনায় দু'হাজার টাকা কিছুই নয়। দু'দিনে নস্যি।'

ঘরের সবাই তখন পুনরায় আশ্বস্ত হলেন, 'তাহলে জামাকাপড়ের দামও সাংঘাতিক হবে। পাউরুটি?'

কাকা বললেন, 'জামাকাপড়? জামাকাপড় ওদেশের কটা লোক পরে? সবাই তো জংলি আর অসভ্য। এখনও সুযোগ পেলে মানুষ মেরে খায়। আর পাউরুটির কথা বলছ? ওসব বিলিতি জিনিস ওখানে পাওয়াই যায় না। সব গোদা গোদা আটার রুটি।'

নাতি কোলে প্রবীণা আমাকে বললেন, 'সেরকম বুঝলে যেও না বাপু। আমার ঘরের ছেলে ঘরেই থেকো। কে কখন মেরে খেয়ে ফেলবে।'

একজন বললেন, 'এটাকে কি আমরা ফরেন যাওয়া বলবো!'

কাকা বললেন, 'না না, সে ফরেন হল অন্য জিনিস, প্লেনে যেতে হয়। পাসপোর্ট লাগে।'

বাবা বললেন, 'ও তো প্লেনেই যাচ্ছে।'

নাতি কোলে বৃদ্ধা বললেন, 'অ্যাঁ, কি সর্বনাশ গো! উড়োজাহাজে চাপবে! ঠিক জায়গায় লাফিয়ে নামতে পারবে তো! ছাতাটা ঠিকমতো যদি না খোলে!'

বৃদ্ধার অজ্ঞতায় সবাই হেসে উঠলেন।

একজন বললেন, 'একেই বলে বরাত! হচ্ছিল না হচ্ছিল না, শেষে এমন হল! ছপ্পর ফাঁড়কে দে দিয়া। তোমরা যে যাই বলো, দিস ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। ছেলেটা দেখিয়ে দিলে, বাঙালীর ছেলে বিজয়চন্দ্র হেলায় করিল লঙ্কা জয়, শক হুণদল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।'

কাকা কোথায় আছেন ভুলে বললেন, 'যাঃ শালা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।'

একজন আমার গা হাত টিপে দেখলেন। দেখতে দেখতে বললেন, 'সোনা

ছেলে। আর একটু, স্লাইটলি একটু মোটা হওয়া দরকার।' আমার গা টিপতে টিপতে মাংসের কথা মনে পড়ে গেল, বললেন, 'তাহলে একদিন কব্জি ডুবিয়ে মাংসর ঝোল আর সরু চালের ভাত হয়ে যাক, রেশনের চাল নয় কিন্তু।'

নাতি কোলে বৃদ্ধা বললেন, 'আমার অনেকদিন বেশ একটু ঘি-টি দিয়ে অড়র ডাল খাওয়ার সাধ।'

এয়ারপোর্টে গিয়ে এই প্রথম বুকটা একটু ঢিপঢিপ করে উঠল। ডান হাতের ওপর বাহুতে মা তিনটে মাদুলি বেঁধে দিয়েছেন। একটা, প্লেন ভেঙে পড়ে না যাবার। আর একটা, নরখাদকরা যাতে খেয়ে না ফেলে। তৃতীয়টা, চাকরির উন্নতি। ওই যে বলে না—খেতে পেলে শুতে চায়। ছ'মাসের মধ্যে, ম্যানেজার করে দেবে। সমুদ্রের ধারে বাংলো, একটা গাড়ি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর নোলায় জল এসে গেছে। এই চাকরিটা আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

পার্বতী এসেছে তুলে দিতে। চুপি চুপি। কাউকে না বলে। বেশ একটা বউ বউ মনে হচ্ছে। আর বিয়ের কি দরকার! পুষ্পকরথে তুলে নিয়ে চলে যাই। সমুদ্রের ধারে হনিমুন। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গে।

প্রেমট্রেমে আমার আর বিশ্বাস নেই। এই সেদিন পার্বতীর বাবা স্ত্রীকে পাশে নিয়ে গদগদ হয়ে ছবি তোলালেন। দেখে মনে হচ্ছিল, 'তুমি আর আমি শুধু'-র চিত্ররূপ। অথচ ওই পার্বতীর বাবাকে আমি আলগাচরিত্রের এক মহিলার ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে দেখেছি। প্রেম নয় পার্বতী এসেছে ফেরত দিতে। আমি ওর জন্যে কিছু কিছু করেছি, সেই করার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। আমি জোর করে বলতে পারব না, তবে মনে মনে বলতে পারি, নালিকুলে সেই হোটেল মালিকের স্বামী-পরিত্যক্তা বোনটিকে পেলে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। যার ঠোঁটের ওপর তিলফুলের মতো ছোট্ট একটি তিল। সারামুখে যার ধানক্ষেতের শ্যামল সরলতা। চুলে নারকোল তেলের গেরস্থালি গন্ধ। জীবনের এই এক ট্র্যাজেডি, প্রথমে মন যার জন্যে পাগল হয়, সে কাছাকাছি এলে আর ভালো লাগে না। তখন মন তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

পার্বতী বললে, 'ধ্যাত্, তুমি চলে যাচ্ছ, আমার ভালো লাগছে না। অত দূরে কেউ চাকরি নেয়! তোমার আর গান শেখা হবে না। আমাকে কবে নিয়ে যাবে!'

'তুমি মা-বাবাকে ছেড়ে অত দূরে গিয়ে থাকতে পারবে?'

'কেন পারবো না! তুমি তো থাকবে।'

আমার আর কিছু বলার নেই। সেই বাঘটার অবস্থা। গায়ে আঠা মাখানো

পাতা লেগে গেছে। ছাড়াতে চাইলেও ছাড়ছে না। পার্বতীর দিকে ভালো করে একবার তাকালুম। বেশ দেখতে মেয়েটাকে। একটু কামুক হওয়াই স্বাভাবিক। রক্তের ধারা। পার্বতীর মা এখনও বেশ ঘটা করে সাজপোশাক করেন। ছাড়ার বয়েস ; কিন্তু ধরার আকুলতা প্রবল।

এই প্রথম প্লেনে চাপছি। আলোর লেখা বেল্ট বাঁধতে বলছে। কায়দাটা জানি না। পাশের ভদ্রলোক অত্যন্ত গম্ভীর। আমারও একটা লজ্জা আছে। নিজে নিজে বেশ কিছুক্ষণ কসরত করলুম। শেষে ঠিক করলুম দড়ির মতো ফাঁস দিয়ে কোমরে বাঁধি। ভদ্রলোক কাগজ পড়লেও চোখ ছিল আমার দিকে। এক সময় বললেন, 'আই উইল শো ইউ।'

ব্যাপারটা খুবই সহজ। প্লেন ততক্ষণে রানওয়ে ধরে তীব্রবেগে ছুটতে শুরু করেছে। এক সময় সামান্য একটু ঝাঁকুনি লাগল। তারপর শরীরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেল। কানে তালা লেগে গেল। প্লেন পাখির মতো আকাশের নীলে। এত ঝকঝকে নীল আকাশ কখনো দেখিনি। তলায় চলে গেছে মেঘ। সোনালি রোদ পেঁয়াজের ফিনফিনে খোসার মতো নীলের গায়ে লেগে আছে। আমি প্রায় হতবাক। আর ঠিক সেই সময় এক সুন্দরী মহিলা গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ভ্যাজ অর নন ভ্যাজ।'

সে কি রে বাবা! তবে বোকা বনতে চাই না, বলে দিলুম, 'নন ভ্যাজ।' আমার সহযাত্রীও তাই বললেন। এসে গেল হজরংবজবং নানা খাবার। দুটো কানে দুটো ছিপি যেন একবার করে ঠেলে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। বেশ মজা তো।

গোল জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে অবাক। কৌচকানো কৌচকানো বিশাল সমুদ্র। তার ওপর ছোট্ট একটা বাগান ভাসছে। আমার পাশের ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আন্দামান এসে গেল। আন্দামান গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস। নিচে এখন যেটা ভাসছে, ওই ছোট্ট দ্বীপটার নাম, নরককুণ্ডম। হয় তো নরককুণ্ড। মৃত একটা আগ্নেয়গিরি। কোনও লোক নেই, জন নেই। শুধু রেনফরেস্ট। আন্দামান গ্রুপে এইরকম অনেক দ্বীপ আছে, যে সব দ্বীপে মানুষ নেই।'

পোর্টব্লেয়ারে প্লেন নামতে নামতে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল ; নাম, এইচ এন সানিয়্যাল। বেশ বড় একটা ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। আমি বুলার কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার শুনে বেশ সমীহ করলেন। ভদ্রলোকই বললেন, আন্দামানে বুলার কোম্পানির বিশাল একটা চাষ

আছে। ওষুধ তৈরিতে লাগে এইরকম গাছগাছালির চাষ। বাগানের পাশেই জারোয়া নামের এক জাতিব বাস। যারা সুযোগ পেলেই বিষাক্ত তীব মেরে সভ্যমানুষদের মেরে ফেলে। গতবছর দশ বাবোজন না কি মারা পড়েছে। বেশ ভয় ধরে গেল। বেঁচে ফিরতে পারবো তো! জামার বুকপকেটে পার্বতীর ছবি। সেইটাকেই চেপে ধরলুম। দেখ মা পার্বতী!

পুঁচকে এয়ারপোর্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল মনে হয়। অনেকেই এসেছেন যার যাব পরিচিতকে রিসিভ করার জন্যে। আমার জন্যে কি কেউ এসেছেন! আসার কথা। ভ্যাবাগঙ্গারামেব মতো এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি, সুন্দর চেহারাব এক যুবক এগিয়ে এলেন। চওড়া গোঁফ। খাড়া নাক। টানা টানা চোখ। বুকপকেটে ক্লিপ দিয়ে একটা কাগজ আটকানো, বুলার কোম্পানি। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।

'আমার নাম শঙ্কর গাঙ্গুলী।'

'আমি শোভনকুমার। আপনি এখানে কি পোস্টে আছেন?'

'অ্যাকাউন্টেন্ট।'

একটা সাদা স্টেশনওযাগন সমুদ্রেব ধার দিয়ে চলেছে। বেশ গরম। রোদে ঝলসে যাচ্ছে চারপাশ। তীরের দিকে সমুদ্রের জল খুব নোঙবা। নানা রকমের আবর্জনা ভাসছে। জলেব রঙ ঘোর কালো। দুটো অদ্ভুত ধরনেব জলদস্যুমার্কা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয ১৬শো কি ১৭ শো সালের কিউরিও।

শঙ্কব গাঙ্গুলী বললেন, 'এ দুটো ইন্দোনেশিয়াব জাহাজ, আমাদের জলে মাছ চুরি কবতে এসে ধরা পড়ে গেছে।'

রাস্তা কখনও উঠছে। কখনও ঢালু হয়ে নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় তেমন গাড়ির জটলা নেই। আমাদের ছোট্ট স্টেশনওযাগন পুনপুন করে চলেছে। শঙ্কর গাঙ্গুলী সিগারেট বের কবলেন। আমার সিগারেট চলে না। তিনি অনুমতি নিয়ে একটা ধরালেন। মনে মনে তারিফ করলুম, 'বাঃ চোর হলেও বেশ ভদ্র।'

প্রথম থেকেই আমি শঙ্কর গাঙ্গুলীকে চোর ভাবতে শুরু কবেছি। ঘাটালিওয়ালা আমাকে আসার আগে বলেছেন, তুমি হলে আমাদেব ঝাঁটা, আমাদের থার্ড আই। তোমার সততার ওপর নির্ভর করছে তোমার প্রোমোশান। শঙ্কর গাঙ্গুলীকে আমি আড়ে আড়ে দেখছি। এত সুন্দর একটা ছেলে চোর। আসলে অফিসের চুরিটাকে আমরা চুরি বলে মনে কবি না। ওটা আমাদের ধর্ম। একটু এদিক সেদিক করে কোনও রকমে একটা বাড়ি করবো; আর ভালোমন্দ খাবো। ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দোব। ছেলেকে লেখাপড়া

শেখাবো। উত্তবপুরুষের জন্যেই চুরি। আমরা সবাই রত্নাকর।

রাস্তা জনপদ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। শঙ্কর গাঙ্গুলী বললেন, 'এ দ্বীপে তিনটি জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই, অলমাইটি সি, অলমাইটি সি অ্যান্ড অলমাইটি গর্জন!'

'সি-টা বুঝলুম, সিসি আর গর্জনটা কি?'

'সিসি হল চিফ কমিশনার আর গর্জন হল গাছ। ডান পাশ বাঁপাশ যেদিকে তাকান দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো। হিয়ার লাইফ ইজ এ বোবিং হেল!

'আমাব তো মনে হচ্ছে হেভেন।'

'প্রথম প্রথম মনে হবে। এখন ওয়েদার ভালো। এব পর যখন বৃষ্টি শুরু হবে তখন বুঝবেন ঠ্যালা। কবিতা বা গল্প লিখতে জানেন?'

'না, কোনওদিন চেষ্টা করিনি।'

'প্রেমপত্র? প্রেমিকা আছে?'

'প্রেম আছে ইকা নেই।'

'আমি মশাই রোজ তিন চাব পাতা প্রেমপত্র লিখি। ইনিয়ে বিনিয়ে, হেলিয়ে দুলিয়ে।'

গাড়ির পেছনের আসনে দু'জনে দুপাশে বসে আছি। বোঝার চেষ্টা করছি শঙ্কব গাঙ্গুলী ছেলেটি কেমন। বাইরে থেকে খুব একটা খারাপ তো মনে হচ্ছে না। বাঁকা করে সিগারেট ধরেছে ঠিকই, তবে খুব একটা স্টাইলিস্ট বলে মনে হচ্ছে না তো!

শঙ্কর গাঙ্গুলী প্রশ্ন করলেন, 'আপনার গান বা বাজনা, কোনও কিছু আসে?'

'হ্যাঁ গান আসে। আপনি কলকাতার ছেলে, বিষ্ণুকুমারের নাম নিশ্চয় শুনেছেন।'

'বাঃ, শুনিনি আবার!'

'আমি বিষ্ণুকুমারের কাছে গান শিখেছি।'

'আচ্ছা। তাহলে আর ভাবনা নেই। আমি সেতার শিখেছি নিখিলবাবুর কাছে। জমে যাবে।'

'আমরা কি মায়াবন্দরে যাচ্ছি?'

'না আমরা যাচ্ছি জিরকাটাং।'

বয়েস তখন কম। ওইরকম এক অজানা মায়াময় জায়গা। বাতাসে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। নির্জন নিরাসক্ত বনভূমি। আমার মনে হচ্ছিল, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। জিরকাটাংই হোক আর ধনিকাড়িই হোক, আমি যে কোনও

জায়গায় নেচে নেচে যেতে প্রস্তুত আছি।

এই সেই নার্সারি যেখানে বুলার কোম্পানির চায-বাস। গেট পেরিয়ে গাড়ি বাগানে ঢুকে গেল। হলুদ রঙের বাড়ি। এ-পাশে ও-পাশে ছড়ানো। নতুন হাল আমলের সব কনস্ট্রাকশন। খুব সুন্দর। একটা বাড়ি একটু লম্বাটে। সেইটা হল অফিস। গেটের মাথাব ওপর বড বড হরফে লেখা, 'বুলারস হারবেরিয়াম'।

বিশাল বিশাল গাছের ছায়ায় যত দূর দেখা যায়, ছোটবড নানা গাছ চড়া রোদে ঝিম মেবে আছে। দূরে দূরে এক একটা ছোট প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে আছে। বিভিন্ন গাছেব ল্যাটিন নাম লেখা। জায়গাটা বেশ শীতল। যেই মনে হল, এখানে আমি বেড়াতে আসিনি, এসেছি চাকর হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সব ভালোলাগা মিইযে গেল। গাডিটা দমকা ঝাঁকানি মেরে একটা গর্জন গাছের তলায় থেমে পড়ল। শঙ্কব গাঙ্গুলী বললেন, 'নামুন। আজকের মতো এইখানেই শেষ।'

'আমি বিপোর্ট কবব কাব কাছে?'

'আজ আব বিপোর্ট নয। বিপোর্ট করবেন কাল। আজ বিশ্রাম। ঘুরে ফিরে দেখা। বিকেলে আবার আমবা পোর্টব্লেয়ারে যাবো। আজ আন্দামানকে চেনাব দিন। আজই আমবা মাযাবন্দরে যেতে পারতুম, কিন্তু আমাদের জাহাজটা পোর্টব্লেয়ারে আটকে আছে। কাল দশটাব সময আমবা জাহাজ পাবো।'

আন্দামান-দিনগুলিব কথা এখন যখন ভাবি তখন মনে হয় স্বপ্ন। নাতি-নাতনি থাকলে গল্প শোনানো যেত। মায়াবন্দব সত্যই মায়াবন্দর। মায়া দিযে ঘেবা। প্রকৃতি প্রাণ খুলে জঙ্গল তৈবি করেছেন। অন্ধকাব অন্ধকার বনভূমি। পাতা আর ডালপালা সবিযে সূর্য মাঝেমধ্যে উঁকি মেরেছেন, তলায় কি আছে দেখাব জন্য।

মাযাবন্দরে বুলাব কোম্পানিব অফিস বেশ বড। ম্যানেজার পারিখকে প্রথম দর্শনে মনে হল, প্রশান্ত, ধার্মিক এক মানুষ। কি কবে হেড কোযার্টারের ধারণা হল পারিখ একটা চোর! ভদ্রলোক ভালো বাঙলা জানেন। আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আবে ভাই আসুন আসুন। কোথাকার ছেলে কোথায় এসেছেন চাকরি কবতে। সো ইয়াং। নারায়ণ নারায়ণ। বসুন। প্লিজ সিট ডাউন।'

খটকা লাগল একটা জাযগায, কথায় কথায় নারায়ণ বলাটা। ভদ্রলোকের এমন কিছু বয়স ছিল না। কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। আর থেকে থেকে নারায়ণ বলা। শঙ্কব গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লোকটি কেমন?'

শঙ্কর বলেছিলেন, 'লোকের বিচার করতে আসিনি। এসেছি টাকা কামাতে।

বলতে পারব না পারিখ কেমন লোক। আপনারই বা কি প্রয়োজন!'

প্রথম দিন পারিখ ভদ্রতা করে রাতে আমাকে তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমার খুব একটা আনন্দ হয়নি। আমি একটু লাজুক স্বভাবের। বাঙালী কারুর বাড়িতে খেতে গেলে কিছু একটা নিয়ে যায়। আমার কাছে কলকাতার এক বাক্‌সো মিষ্টি ছিল। সেই মিষ্টি নিয়ে সন্ধের একটু পরেই পারিখের বাংলোয় গেলুম। সেদিন আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠেছিল। স্নিগ্ধ আলোয় ধ্যানমৌন বিশাল গর্জন। মসৃণ দেহকাণ্ড বেয়ে যেন তেল গড়াচ্ছে। বিশাল জায়গা জুড়ে পারিখের বাংলো। সবুজ লন। কেয়ারি করা ফুলের গাছ। বাংলোর পেছনে সমুদ্র। সামনে জঙ্গল। লনে পা রেখে মনে পড়ল বাটালিওয়ালার প্রতিশ্রুতি। ছ'মাসের মধ্যে তুমি ম্যানেজার হবে। ছ'মাস পরে এই বাংলোটা আমার হয়ে যাবে। লোভে ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। পার্বতী নয় নালিকুলের সেই মেয়েটিকে নিয়ে আসবো। এই লনে, এমনি চাঁদের আলোয় দু'জনে পাশাপাশি গার্ডেন চেয়ারে বসে থাকবো। চারপাশে প্রহরী গর্জন। সমুদ্রের নোনা বাতাস জঙ্গলের নৈশ শব্দ। চাঁদ ডুবে যাবে পশ্চিমে।

লন পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি উঠে গেছে কাঁচের দরজায়। আলো ঠিকরে পড়ছে। ভেতরটা অসাধারণ সুন্দর করে সাজানো। এই ভাবে বসবাস করার আমরা অভ্যস্ত নই। এ যেন সামুদ্রিক জাদুঘর। দরজার এপাশ থেকে আমার চোখে পড়ছে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। হরেক বর্ণের মাছ খেলা করছে। চাঁদা মাছের মতো একটা মাছ তার গায়ের বর্ণ সোনালি, মাঝে মাঝে রুপোর টিপ। এমন মাছ স্বপ্নেই দেখা যায়।

পুজোয় বসেছেন পারিখ। দরজা খুলে দিলেন, মনে হয় তাঁর স্ত্রী। আমি কবিতা লিখি না ; তবে আমার মনে হয়েছিল, মহিলা জীবন্ত কবিতা। চোখ দুটো অবিকল মা দুর্গার চোখের মতো। তিলফুলের মতো নাক। দরজা খুলে দেবার সময় চুড়িপরা ডান হাতটার দিকে তাকিয়েছিলুম। ছাঁচে মোম ঢালাই করে তৈরি। মানুষের হাত কত সুন্দর হতে পারে!

আন্দামানের বিখ্যাত মার্বেল কাঠের তৈরি সোফায় বসে, ঘরের এ-ধারে ও-ধারে তাকাতে তাকাতে মন ঘুরে গেল। এমন একটা সংসার একমাত্র শয়তানেই ভাঙতে পারে। আমাকে কলকাতা থেকে শয়তান করেই পাঠানো হয়েছে। হলেও, আমি জাত শয়তান নই।

বসার ঘরের পাশেই ঠাকুরঘর। একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। ধূপের গন্ধে ঘর

আমোদিত। পায়ে পায়ে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গেলুম। সেন্টার টেবিলের ওপর নারায়ণের ছবি। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। দেওয়াল ঘেঁষিয়ে দাঁড় করানো। ঘরটার চারপাশে ঝকঝকে কাঁচের জানালা। ডানদিকের একটা জানালায় সমুদ্র সফেন। মেঝেতে আসনে বসে ধ্যানস্থ পারিখ। দরজার এপাশে আমিও মেঝেতে বসে পড়লুম। ধর্ম অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি। কলকাতাতেই কৃষ্ণসখা পার্থসারথি আমার মনে কৃষ্ণের ছ্যাকা দিয়েছিলেন। বসামাত্রই আমার চোখ অর্ধনিমীলিত হয়ে এল।

আমার পাশে কে যেন বসলেন। পিঠের পেছন দিকে স্পর্শ। তাকিয়ে দেখি শ্রীমতী পারিখ আমার তলায় সুদৃশ্য একটা আসন গুঁজে দেবার চেষ্টা করছেন। অভিভূত হলুম। তিনি হাত জোড করলেন। তাব মানে বলতে চাইলেন, বিবক্ত করার জন্যে মাপ করবেন। আমি তাড়াতাড়ি আসনটা টেনে নিয়ে, হাত জোড করলুম। ভদ্রমহিলার এই বোধটির নামই মানুষের ধর্ম।

আবার চোখ বুজলুম। চোখের সামনে নারায়ণ আর এলেন না। শ্রীমতী পারিখের টিপ পবা প্রতিমার মতো মুখ। মা দুর্গার মতো দুটি চোখ। সারা বাড়িতে কোথাও কোনও শব্দ নেই। পর্দার তলায় ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। বাতাসে পর্দা দুলছে। ঘণ্টার টিংলিং শব্দ। বাতাস. সমুদ্রের অস্পষ্ট গর্জন।

পাবিখ বোধহয় ছোট্ট একটা ঘণ্টা নাডলেন। আমার চোখ খুলে গেল। বেশ একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। ধর্মের সঙ্গে নারীর খুব যোগ আছে। ঠাকুর বামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছিলেন, সেক্সটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই ধর্ম হয়ে যায। জীবন তো মুদ্রাই। সেই মুদ্রাব এক পিঠে কাম, অন্য পিঠে ধর্ম।

ঘণ্টা শুনে শ্রীমতী পারিখ ঘরে এলেন। একপাশে বসে টেনে নিলেন হারমোনিযাম। কি গলা! কি সুর! আমাব নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পডল। কলকাতাব অহঙ্কারী বেলুন, চুপসে চামচিকি। ইমনকল্যাণে ধরেছেন, মীরাব ভজন, হরি তুম হরো জন কী ভীর। দ্রৌপদী কো লাজ রাখ্যো, তুম বঢ়াযো চীর ॥ ভক্তকারণরূপ নরহরি, ধর্যো আপ শরীর। হরিণকশ্যপ মার লিহ্যো, ধর্যো নাহিন ধীর ॥ হে হরি, তুমি তোমার ভক্তদের ত্রাণ কর। তুমিই দ্রৌপদীব বস্ত্র প্রসারিত করে তার লজ্জা বাঁচিয়েছিলে। ভক্ত প্রহ্লাদের জন্যে নৃসিংহ-রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ কবেছিলে।

বাতাসের ঝাপটায় সুর আবীরের মতো উড়ছে। আমার চোখে জল এসে গেছে। আমার এই রকম হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার হয়। বাস্তব-জ্ঞান শূন্য বোকা তো! তা না হলে, প্রথম দিন পার্বতীর নগ্ন শরীর দেখে কেঁদে ফেলি। সে

কি তালশাঁসের মতো কান্না ! চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। পার্বতী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চওড়া পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবি, ঈশ্বর এই মসৃণ পিঠ তুমি আমার জন্যে করেছ। এই অসাধারণ নিতম্ব তুমি আমাকে দান করেছ। ওই মোমের মতো ভরাট পা দুটো আমার। যত ভাবি, ততো কাঁদি। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে পার্বতীর পিঠে। চট করে ঘুরে চিৎ হয়ে শুয়ে পার্বতী বলেছিল, 'এ কি তুমি পড়া না পারা স্কুল-বালকের মতো কেঁদে ভাসাচ্ছো কেন ?' তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। নারীর এ পিঠের চেয়ে ও পিঠ যে আরও কত সাংঘাতিক তা তো জানতুম না। সোজা দিকটা দেখে একেবারে হাপুস। উ রে বাবারে ! ঈশ্বর তুমি বুকে কি ভবে রেখেছো ! ও দুটোও আমার ! হয় আমি অচৈতন্য, নাহয় হতচৈতন্য কিংবা সমাধিস্থ যে কোনও একটা হয়ে গিয়েছিলুম। সমাধি বলেই মনে হয় ; কারণ আমার মন ভীষণ ওঠানামা করে। গানের গলার মতো এই উদারায় এই তারায়।

শ্রীমতীর গান শুনে আমার কেমন যেন সমাধির মতো হয়ে গেল। মনে হল, এই তো আমার মীরাবাঈ। কেউ কিছু বোঝার আগে হামা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঝা করে মাখনের মতো পা দুটো ছুঁয়ে টিস্ করে একটা প্রণাম করলুম। পা স্পর্শ করতে গিয়ে উরুতে হাত ঠেকেছিল। মনপাগলা সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে উঠল, উঃ, কি নরম ! পারিখ কিছু করার আগেই ঝটিতি তাকেও একটা প্রণাম করে ফেললুম। আমার এই ঝটিকা আক্রমণে গান কিন্তু থেমে গেল।

শ্রীমতী হতবাক। হবারই কথা। এঁদের তো প্রণাম করার মতো কেউ নেই ! পারিখ ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'এ কি, এ কি ! এ আপনি কি করছেন শোভনজী। এ আপনি কি করছেন ?'

আর কি করছেন ? শোভনজীর তো ঢিপঢাপ প্রণাম করাই অভ্যাস। নিজে নির্গুণ, কারুর ভেতর গুণ দেখলেই নিজের ভেতরের মরুভূমি বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গুণীর পা জোড়াকে মনে হয় পান্থপাদপ। মাথাটা ঠেকাতে পারলেও তৃষ্ণার তৃপ্তি।

পারিখের কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলুম ; কিন্তু তখন আমার ভরের অবস্থা। আমি ক্রমাগত বলে চলেছি, 'আঃ কি নরম ! উঃ কি কষ্ট !'

পারিখ দম্পতি কষ্টটা বুঝতে পারছেন। ভদ্রলোক গানের গলা শুনে মোহিত হয়েছেন। পাগলের মতো হয়ে গেছেন। দ্যাটস অল রাইট। বাট হোয়াট ইজ নরম ? লোকটা নরম বলছে, না গরম বলছে ? আমি ঘরের মাঝখানে বুঁদ হয়ে বসে আছি। দু চোখের কোলে জল। সামান্য গান জানা থাকলে, গান শুনলে

গান আসে। আমি গাইতে শুরু করেছি, হরিনাম সুমর সুখধাম জগত মে জীবন দো দিনকা ॥

নেহাত খারাপ তো গাইতুম না তখন ! গলায় সুর ছিল। মনে বেগ ছিল। এখন বয়েস হয়েছে। গলা গেছে। কণ্ঠে কফ আর পিত্ত। চোখের জ্যোতি মরে আসছে। শ্রীমতী হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'আবে দাদা, আপনিও তো ভাল গান জানেন।'

খুব গান হয়েছিল সেদিন। শেষে তিনজনের কোরাস।

চাঁদের আলো। সবুজ লন। চারপাশে মাথাউঁচু গর্জন। সমুদ্রের ঝটকা বাতাস। আহারাদির পর তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসে আছি। পায়ের নিচে নরম দিলবাহার ঘাস। ধর্মের মেজাজ হারিয়ে গিয়ে সেই রোমান্টিক মেজাজটা ফিরে আসছে। পারিখের ওপর হিংসে হচ্ছে। লোকটা কি সুন্দর একটা বউ করেছে। সিল্কের ফুলছাপ শাড়ি পরেছে। কানে হীরের দুল। যেই মাথা নাড়ছে আলোর তীর ছিটকে আসছে। যার ভালো তার প্রতিটি ইঞ্চি ভালো। ভদ্রমহিলার চুল যেন সিল্কের মতো। বাতাসে একটা দুটো কপালের কাছে উড়ছে, চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে, জরি উড়ছে, জরি। ভদ্রমহিলার শরীরটা যেন দীঘির মতো। ভরাট দুটি সিল্ক মোড়া জানু। একেবারে ঠিক আমার হাতের পাশে। কিছু না, অসাবধানে হাতটা চেয়ারের পাশে ঝুলে পড়লেই স্পর্শ পাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি গেয়ে উঠলুম, 'ম্যায় নেহি মাখন খায়ো।' একটু আগেই শ্রীমতী পারিখ অতি যত্ন করে ভরপেট সুখাদ্য খাইয়েছেন ; তখন মাখন খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। বুঝলুম মন কেন মাখন মাখন করছে। এ মাখন সে মাখন নয়। নিজের মনটাকে নিজেই বুঝে উঠতে পারলুম না আজও।

গানের প্রথম লাইনটা শুনে শ্রীমতী বললেন, 'বড় সুন্দর গান। বাল গোপালের লীলা। যখনই শুনি, জল এসে যায় চোখে। দাদা, আপনি ওঁকারনাথজীর গলায় গানটা শুনেছেন কোনওদিন ?'

'না দিদি।'

'আমার কাছে রেকর্ডটা আছে, আপনাকে শোনাবো একদিন।'

পারিখ বললেন, 'শ্রীমতী তুমি এবার ভেতরে যাও। বাতাস খুব ঠাণ্ডা। তোমার গলায় কাল কষ্ট হবে।'

আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। এ আমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। ভদ্রমহিলার নাম আমি শ্রীমতীই ভেবেছিলাম।

শ্রীমতী বললেন, 'হ্যাঁ আমি যাই। আমি তোমাদের জন্যে একটু কফি করি।'

শ্রীমতী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই বাতাসের ঝটকায় শাড়ির আঁচল উড়ে আমার মাথায় মুখে জড়িয়ে গেল। আঁচলের সুগন্ধ। আমার মা দেখলে বলতেন, শিগগির যা, গায়ে মেয়েদের আঁচল লাগা খুব খারাপ, গঙ্গাজল ছিটো মাথায়। এ তো লাগা নয়। একেবারে জড়িয়েমড়িয়ে ভুষ্টিনাশ হয়ে যাওয়া। নির্বাণ কাকে বলে জানি না। তবে সেই অবস্থায় মনে হয়েছিল, আমার নির্বাণ।

আঁচল ছাড়াতে একটু সময় লেগে গেল। গোল্ডফ্রেম চশমার সঙ্গে আঁচলের সুতো জড়িয়ে আমার মনের মতো একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল। শেষে চেয়ার ছেড়ে পারিখকে উঠে আসতে হল। আমি মনে মনে আমার সরু ফ্রেমের শৌখিন চশমাকে হাজারটা ধন্যবাদ জানালুম। সেই একবারই আঁচল চাপা পড়েছিলুম। অনেক পরে একবার রিকশা চাপা পড়েছিলুম। এখনও পর্যন্ত আর কোনও কিছু চাপা পড়িনি।

পারিখ কিছু করতে পারলেন না। আমিই চশমাটা ধীর ধীরে কায়দা করে চোখ থেকে খুলে আঁচল সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করলুম। আর আমার চোখের সামনে চাঁদের আলোয় খাজুরাহো। চশমার হিঞ্জের সঙ্গে সিল্কের সুতো জড়িয়ে বসে আছে।

শ্রীমতী বললেন, 'আই অ্যাম সরি।'

মনে মনে বললুম, 'আই অ্যাম গ্ল্যাড।' পৃথিবী টেরিফিক রোম্যান্টিক জায়গা। এই কাঠকুটো, কয়লা, উনুন, চাল, ডাল, নৈনিতাল আলু, মাঝখান থেকে এই সব এসে পড়ায় ক্যাডাভেরাস হয়ে গেছে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে যদি কেউ এক কোটি টাকা ফিকসড করে দিত, তাহলে আর দেখে কে! একটা কানন কিনে কোকিলের চাষ করতুম।

শ্রীমতী ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে চলে গেলেন। সুন্দরী আরও সুন্দরী হন যদি তার সঙ্গে নম্রতা, কমনীয়তা, স্নেহপ্রবণতা মেশে। যেমন একটু নীলের ছোঁয়ায় সাদা আরও সাদা হয়।

পারিখ বললেন, 'আমার স্ত্রী আপনার চুল এলোমেলো করে দিয়েছেন, একটু ঠিক করে নিন।'

চুল ঠিক করে নিলুম। পারিখ বললেন, 'কোম্পানি আপনাকে কেন পাঠিয়েছে আমি জানি। আপনার মতো আমাকেও পাঠিয়েছিল। তখন মিস্টার দাস ছিলেন ম্যানেজার। আমাকেও বলা হয়েছিল, করাপসান ধরতে হবে। সবাই যে-দেশে করাপ্ট সেখানে আপনি কাকে ধরবেন! এখানে একটু বাড়াবাড়ি করলেই মৃত্যু। আমরা জারোয়া জারোয়া করি। জারোয়ারা মারে না! মারে স্থানীয় লোকেরা।

মেরে জারোয়াদের নামে চালিয়ে দেয়। কোনও কেস হয় না। এই দ্বীপের বেশির ভাগ অধিবাসী হল অপরাধীদের বংশধব। তবু অনেক ঝুঁকি নিয়ে কিছু কিছু লুপহোলস বন্ধ কবেছিলুম। শেষে একদিন ঘাড়ের ওপর গাছেব গুঁড়ি ফেলে মারার চেষ্টা হল। অল্পেব জন্য বেঁচে গেলুম।'

'আপনাকে কে মারার চেষ্টা করেছিলেন?'

'খুব লজিক্যাল ব্যাপার। আমি এসেছি করাপসান ধরতে। সম্ভাব্য দুর্নীতিপবায়ণ লোকটি কে? মিস্টাব দাস? অতএব মিস্টার দাসই হলেন নাম্বারওয়ান সাসপেক্ট। ভদ্রলোক ভিকটিমাইজড হয়ে চলে গেলেন। পরে ভদ্রলোক আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি থেকে ব্যাপারটা মানে চক্রান্তটা আমার কাছে পবিষ্কার। এই করাপসানের কটটা রয়েছে কলকাতায়, আর ডালপালা সব এখানে। ম্যানেজার হাটানোর চক্রান্তটা কলকাতায় হয়। বোকা, ওপর চালাক একটাকে ডেপুটি করে পাঠায়। তার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। মরে গেল তো দুটোই গেল। আর তা না হলে, একটা গেল একটা রইল। মিস্টার দাসের আগে, একজন ডেপুটি নিহত হয়েছেন। এখানেও তো ভালো লোক, সাঁচ্চা লোক আছে, তারা আমাকে পরিষ্কার করে সব বলে দিয়েছে। এখানে সাতটা লোকেব একটা গ্রুপ আছে। সেই সাতজনের একজন হল একস কনভিক্ট। তাব নাম গম্ভীরা। সে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে। তার হাতেই ছিল আমাকে মারার প্ল্যান। আমিও আপনার মতোই বোকা, ওপর চালাক, মূর্খ আদর্শবাদী। এখানে আসার সাতদিনের দিন আমাকে মারাব চেষ্টা হল। ফরেস্ট লগ স্ট্যাক করা আছে। জাহাজে উঠবে ফর ম্যাডরাস। আমি পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিং মেলাচ্ছি; হঠাৎ উলটো দিক থেকে একটা ট্রেইন্ড হাতি এক ঠেলা মেবে স্ট্যাকটাকে ধসিয়ে দিলে। ফ্রাকসান অফ এ সেকেন্ড, নারায়ণ সেভড মি। পরে গম্ভীরা এসে আমাকে বললে, মিঃ দাসের কাজ। আমি বিশ্বাস করলুম, আরও করলুম এই কারণে মিঃ দাস ঠিক সেই দিন সকালেই চলে গেছেন পোর্টব্লেয়ারে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আমার তৎপরতা। হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলুম বিশাল এক নোট। মিঃ দাসকে নিয়ে পুলিশ খানিক টানা হ্যাঁচড়া করল। শেষে তিনি বেনিফিট অফ ডাউট পেয়ে গেলেন। শোভনজী আমাব কেসটাও আজ থেকে ঠিক সাত দিনের মধ্যে ওই রকমই দাঁড়াবে। আমি একদিন সকালে মেসেজ পাবো, গো টু পোর্টব্লেয়ার আর সেইদিনই আপনার ওপব অ্যাটেম্পট হবে। এখন আমার সামনে দুটো পথ খোলা আছে, এক আপনাকে প্রোটেক্ট করা। দুই, কালই রেজিগনেশান দিয়ে চলে যাওয়া। এই দুটো পথের

কোনটা আমি বেছে নেবো, আমাকে জানতে হবে ধ্যানে।'

'মিঃ পারিখ, ধ্যানের প্রয়োজন নেই ; আমি এই চাকরিব ফাঁদে পা দেবো না। আমিই চলে যাবো। আপনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, শ্রদ্ধা করে ফেলেছি। আপনার মঙ্গলকামনা করি।'

'শোভনজী ওটা কোনও সলিউশান হল না। আমাকে যেভাবেই হোক সরাবে। আমাকে না সরালে ওপর দিকে ঘুটি পড়ে যাবে। আপনি চলে গেলে আর একজনকে পাঠাবে।'

'সেও তো যেই আমার মতো জেনে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পালাবে। কে আব সাধ করে গুঁড়ি চাপা পড়ে মরতে চায়!'

'সে আপনার মতো এমন ফ্রেন্ডলি, এমন মিষ্টি স্বভাবের নাও তো হতে পারে। যে এসেই আমাকে চোর ভাববে সে তো পুলিশের মতো আচরণ করবে।'

'তা হলে?'

'আপনাকে বাঁচাতে কালই আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে।'

সারা রাত ঘুম হল না। কি করা যায়? আমার পরশ্রীকাতর আত্মীয়-স্বজনদের সন্দেহটা তাহলে ফলে গেল। পাঁঠাটার কপালে সিঁদুর দেগে কলকাতা থেকে ঠেলে দিয়েছে আন্দামানে বলি হবার জন্যে। নতুন জায়গা। একতলা বাঙলো। চারপাশে জানালা। বাইরে জঙ্গল। ছমছমে চাঁদের আলো। কেবলই মনে হতে লাগল, গ্রুপ অফ সেভন আজ রাতেই না শেষ করে দেয়।

সকালে ফরেস্ট অফিসে মিঃ পারিখ বললেন, 'আমিও ভাবছি ; তবে আপনি কোনওরকম ঝুঁকি নেবেন না। কিপ ইওর আইজ অ্যান্ড ইয়ারস ওপেন।' শঙ্কর গাঙ্গুলী খাতা খুলে বসেছে। এই দ্বীপে বছরের পর বছর একা বাস করে একটু একবগ্গা মতো হয়ে গেছে। পরামর্শ চাইলেও উপদেশ পাবো না।

শঙ্করবাবুর টেবিলে মাস্টাররোলটা পড়েছিল। তুলে নিয়ে উলটে পালটে দেখলুম সত্তরজন বাঙালী কাজ করে। যেখানে সত্তর জন বাঙালী, সেখানে একটা ধর্মঘট ডাকা যায় না! মাস তিনেক ধর্মঘট করে দিতে পারলেই, সকলেব সব রস মরে যাবে। বাঙালী হয়ে এই সামান্য কাজটা পারবো না?

সেই দিনই সুযোগ এসে গেল। প্রায় সেই মুহূর্তে। ভাগ্যবানের বোঝা চিরকালই ভগবানের কাঁধে। খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা খুব শুকনো চেহারার একটা লোক শঙ্কর গাঙ্গুলীর কাছে এসে একশোটা টাকা অ্যাডভানসের জন্যে খুব দরবার করতে লাগল। লোকটি পূর্ব বাঙলার রিফিউজি। লোকটি যত ভাঙতে লাগল

শংকর গাঙ্গুলী তত চড়তে লাগল। লোকটি প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, শেষে উবু হয়ে বসে পড়ল। পরনে একটা হাফপ্যান্ট, তার ওপর কাঁধকাটা ময়লা একটি গেঞ্জি। কোমরে একটা গামছা বাঁধা। কালো, লোমঅলা, রোগারোগা দুটো পা বেরিয়ে আছে। দীর্ঘদিন লোকটি না খেয়ে আছে মনে হল।

শঙ্কর গাঙ্গুলী বললে, 'এখানে তুমি সারাদিন বসে থাকতো পারো, একটা টাকাও তুমি পাবে না। নো অ্যাডভানস।'

সুযোগটাকে হাতে নেওয়া যাক। এমনেও পালাতে হবে। অমনেও পালাতে হবে। শঙ্কর গাঙ্গুলীর টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললুম, 'আপনার বাপের টাকা। অভাবে পড়েছে, বিপদে পড়েছে, দিয়ে দিন একশোটা টাকা। অ্যাতো বড় একটা কোম্পানি, টাকার অভাব। এদের রক্ত জল করেই তো কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে।'

শঙ্কর গাঙ্গুলী এতটা আশা করেনি। লোকটি মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। রোগা বুকটা একটু চিতিয়েছে। মরা মরা চোখ দুটোয় আলোর ঝিলিক লেগেছে।

আমি সেই মুহূর্তে আর এক ডোজ ছাড়লুম, 'বের করুন আপনার ক্যাশ বাকসো। দিন একে একশোটা টাকা। কি নাম তোমার?'

'আজ্ঞে আমার নাম বিজয় হালুই।'

'নিন, বিজয় হালুইয়ের নামে একশোটা টাকার একটা ভাউচার তৈবি করুন।'

দু'জনের কেউই আমার চালটা বুঝতে পারছে না। শঙ্কর গাঙ্গুলীর দু'চোখে রাগ, বিস্ময়, বিজয়ের চোখে কৃতজ্ঞতা। আমি বিজয়কে ধরে সত্তর জন অভাবী বাঙালীর কাছে পৌঁছতে চাইছি। সত্তরটা লোক যদি আমার পেছনে থাকে, গম্ভীরার সাতটা চোর আমার কী করবে? তুলে কালাপানিতে। একবার এসেছি যখন সহজে ফিরছি না। আমার সেই একঘর আত্মীয়স্বজন। আবার সেই হাঁচি, কাশি, অন্তরটিপুনি কথা, 'তখনই আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছিল, বরাত কি অত সহজে খোলে! সাধারণ এম· এ আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে।' আসার সময় সংসার থেকে হাজার টাকা এনেছি, ইস্তফা দিয়ে ফিরতে হলে সেই হাজার টাকায় হাত পড়ে যাবে। সেটাও কম লজ্জার নয়। চাকরির বদলে আন্দামান ভ্রমণ।

শঙ্কর গাঙ্গুলী আমার মনের কথা তো জানে না। প্রকৃত রেগে বললে, 'হু আর ইউ?'

তাকে আরও রাগিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'তোমার বাপ।'

আমি জানতুম এর উত্তরে ওই বোদামার্কা, আত্মকেন্দ্রিক শঙ্কর গাঙ্গুলী কি করবে ! আত্মরক্ষার সামান্যতম চেষ্টাও আমি করলুম না। ব্লাম করে একটা ঘুসি এসে পড়ল আমার নাকের কাছে। সামনের একটা দাঁত খুলে পড়ে গেল। দাঁতটা একটু নড়বড়েই ছিল। এর আগে কলকাতায় বাড়ির বাথরুমে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলুম। দাঁতটা পায়ের কাছে মেঝেতে ঠকাস করে পড়ল। নিচু হয়ে তুলে নিলুম। নাক আর মুখ দু'জায়গা দিয়েই প্রচুর রক্তপাত। আমি তখন রক্তই চাইছিলুম। বেশ জামাটামা ভেসে যাবে। লোক খ্যাপাতে গেলে রক্তের চেয়ে ভালো উত্তেজক কিছুই নেই।

নিমেষে খববটা ছড়িয়ে পড়ল। আমি সেই অবস্থায় কাঠের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে জীবনের মারাত্মক বক্তৃতাটা দিয়ে ফেললুম। জ্বালাময়ী ভাষণ। 'বন্ধুগণ, ভাইয়ো, কমরেডস, আজ আমাদের রক্ত ঝরছে, কাল ওদের রক্ত ঝরবে। এরা কোটি কোটি টাকা কামায়, আর আমাদের একশোটা টাকা দিতে, ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দেয় ! এই সেই দাঁত। মেহনতি জনতার দাঁত। আমাদের একটা দাঁতের বদলে ওদের একশোটা দাঁত চাই।'

জমায়েতের সকলে চিৎকার করে উঠল আক্রোশে। করবেই। সাধাবণ মানুষের ধর্ম। তোমার আছে আমার নেই। হ্যাভস আর হ্যাভনটসের লড়াই। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। চচ্চড় করে নিচের ঠোঁটটা ফুলে উঠছে। নাকের বক্ত থামেনি। সমানে ঝরছে। আমি আবার শুরু করলুম : 'আমরা মেন ল্যান্ড থেকে দূরে আছি, তাই আমরা জানি না, আমাদের কি পাওয়া উচিত ? তোমরা এখন যা পাচ্ছ তার চার ডবল মাইনে পাওয়া উচিত। বছরে একবার বোনাস পাওয়ার কথা। পাওয়ার কথা, ভালো থাকার জায়গা। বিনা খরচে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাবাব জন্যে স্কুল কোথায় ! কোথায় খেলার মাঠ ! সপ্তাহে একদিন সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা। সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি চাই ! আটঘণ্টার বেশি খাটবো না। আমরা স্বাধীন ভারতের শ্রমিক, ক্রীতদাস নই। ইন-কিলাব।'

সবাই চিৎকার করে উঠল, ইন-কিলাব।

সুর ধরে গেছে। বারুদে আগুনেব ফুলকি, যাবে কোথায় ? শেষটায় আমি আর বুঝতে পারছিলুম না, অভিনয় করছি না প্রকৃত লড়াই করছি। ঠিক এই সময় গম্ভীরা আমার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল। হাতে একটা লাঠি, সঙ্গে তার ছ'জন চেলা। মারমুখী হয়ে তেড়ে এল, 'আবে শালা, কামমে চল।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে বললুম,'কোম্পানির দালাল। কোম্পানির গুণ্ডা।

দুশমনকে চিনে নাও, এই মাটিতে কবর দাও। ইন-কিলাব।'

জনতা তেড়ে গেল গম্ভীরার দিকে। গম্ভীরা লড়ে ভালো। যা চাইছিলুম তাই হল। আমাদের একটা লাশ পড়ে গেল। মারমুখী শ্রমিকরা বুলার কোম্পানির অফিস ভেঙে চুরমার করে দিল। একটা স্টেশনওয়াগনে আগুন লাগানো হল। সব শেষে আমি একটা চেয়ারে উঠে, পরপর তিনবার হেঁকে বললুম, 'কাম বন্ধ, ধর্মঘট। আমাদের দাবি মানতে হবে।'

আমরা ম্যানেজার পারিখকে ঘেরাও করলুম। শঙ্কর গাঙ্গুলী অফিস ছেড়ে পালিয়েছে। ম্যানেজারকে বললুম, 'পুলিশ ডাকুন।'

পারিখ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফোন তুললেন। আমি খিচিক করে চোখ মেরে দিলুম। আমার কলকাতার রকে বসা সার্থক হয়েছে। রকের ট্রেনিংই ট্রেনিং। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে কাঁচকলা দিয়েছে। চোতা একটা কাগজ দিয়েছে। গম্ভীরা আর তার ছটা চ্যালাকে আমরা কাঠের গুঁড়িব সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। আসুক পুলিশ। আমাদের রাখাল মারা গেছে। দশ বারোজনের সাংঘাতিক চোট লেগেছে।

পুলিশ এসে গেল! গম্ভীরা আর তাব চ্যালারা চলে গেল পোর্টব্লেয়ারে। ব্যাটা মার্ডার চার্জে পড়ে গেছে। পুলিশ আমার স্টেটমেন্ট নিয়ে গেল। স্টেটমেন্ট দেবার সময় আমি আমার ভূমিকাটা ঘুরিয়ে নিলুম। তখন আর আমি শ্রমিক নেতা নই, বুলার কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার। সেই রাতেই ক্রিমিন্যাল অফেন্সের জন্যে ম্যানেজারকে দিয়ে সাতটা লোককে বরখাস্ত করা হল। রিপোর্ট চলে গেল কলকাতার অফিসে। চেম্বার অফ কমার্সে। আন্দামানের কাগজ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্কলে। আর আমি রাতটা কাটালুম হাসপাতালে। ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ চালাই আর ভাবি, দু'হাজার টাকার জন্যে একটা কেন দুটো দাঁত দিতেও আমি প্রস্তুত আছি। পাঁঠাব মাংস খেতে অসুবিধে হলেও, নরম তুলতুলে চিকেনে খুব একটা অসুবিধে হবে না। যদি হয় কিমা করে খাবো। কাবাব খাবো কি আছে? হাঁড়ি কাবাব।

পোর্টব্লেয়ার থেকে দু'জন নেতা ছুটে এলেন। ইনি বলেন, হোয়াট ইজ ইওর কালার, উনি বলেন, হোয়াট ইজ ইওর কালার। আমি চোখ বুজিয়ে শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছি। কোন দলের হয়ে খেলছি কিছুই জানি না। জার্সির রঙ জানা নেই। গোলপোস্ট পেয়েছি সামনে বল ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে আছি। নেতা দু'জন যেতে যেতে বলে গেলেন, 'মিস্টিরিয়াস পার্টি। রেভলিউশানারি নতুন কোনও একটা পার্টি কোথাও গজিয়েছে।' আমি শুয়ে শুয়ে হাসছি। আমার সামনের

একটা দাঁত মিসিং। দ্বীপভূমি পত্রিকার সাংবাদিক এলেন। হাতে নোটবুক আর পেনসিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। 'আপনার বায়োডাটা ?' আমার প্রশ্ন, 'পলিটিক্সে আবার বায়োলজি আসছে কেন ? জ্যুলজি আসতে পারে।'

'না না, আপনার পরিচয় ?'

'আমার পরিচয়, আমি মানুষ।'

'ইউ হ্যাভ টেকন দি আইল্যান্ড বাই স্টর্মস। প্রায় সিপাহী বিদ্রোহের মতো ব্যাপার। আপনার কি কি গেছে ?'

'আমাব একটা দাঁত গেছে আর নাকটা থেবড়ে দিয়েছে। দ্যাটস অল।'

'আপনি কোন দলের ?'

'শ্রীকৃষ্ণ।'

'আই সি। কম্যুনাল। শ্রীকৃষ্ণলাল শর্মা। সায়েব ম্যানেজারকে ফারনেসে ফেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।'

'আমার কৃষ্ণ, গীতার কৃষ্ণ। যথা নিযুক্তহস্মি তথা করোমি।'

'মিনিং প্লিজ।'

'তিনি আমাকে যা যা করতে বলবেন আমি তাই করবো। যদা যদাহি ধর্মস্য··· ।'

'আই নো। দ্যাট শ্লোক, আই নো। ধর্মের গ্লানি, এটসেটরা, এটসেটরা··· ।'

'ইয়েস যদা যদা হি ধর্মস্য, এটসেটরা, এটসেটরা···'

ইংরেজরা একটা শব্দ বের করেছিলেন বটে, এটসেটরা। পারিখ বললেন, 'এরপর কি হবে ?'

'কি আবাব হবে চক্র খতম। এখন আমরা গাছ ফেলবো, আর কলকাতায় চালান দোব, মাদ্রাজে চালান দোব।'

অতই সহজ। হাজার শ্রমিক আমাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বললে, 'বোস শালা। কোথায় আমাদের চার ডবল মজুরি, কোথায় আমাদের বোনাস, হেলথ সেন্টার কোথায়, কোথায় স্কুল ?'

হাজাবটা হাজার রকমের মুখ ক্ষুধার্ত হায়নার মতো তাকিয়ে আছে। চারপাশে বিশাল বিশাল গাছ। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিন ঝিন করে। গোটা দশ হাতি শুঁড় তুলে গাছের উঁচু ডাল ভাঙছে। শুকনো পাতায় পা ঠুকছে।

একজন বললে, 'রাখাল মরেছে, তার বউকে টাকা দিতে হবে। সেই টাকা তুমি আমাদের পাইয়ে দেবে। সাত দিনের মধ্যে, তা না হলে তোমাকে আমরা মাটিতে পুঁতে দেবো। গর্জন গাছ হয়ে যাবে।'

মহা বিপদে পড়ে গেলুম। এ তো দেখছি পালানো যাবে না। এবার সত্যি সত্যিই লড়তে হবে। তা না হলে ফ্র্যাংকেনস্টাইন আমাকে মেরে ফেলবে। জয় নারায়ণ। জাগো ভেতরে জাগো। বসেছিলুম, উঠে দাঁড়ালুম। গম্ভীরাকে স্মরণ করলুম। এদের দাওয়াই গম্ভীরা। আমি গম্ভীর গলায় বললুম, 'বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে শালা বলেছ, প্রথমে আমার মনে খুব লেগেছিল। পরে ভেবে দেখলুম, তোমরা মনের জ্বালায় বলেছ। নেতাকে কেউ শালা বলে। এই দ্যাখো তোমাদের জন্যে আমার একটা দাঁত গেছে। এই দ্যাখো, দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ লিক করছে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে। একটা দাঁত গেছে। দাঁতের বদলে দাঁত, রক্তের বদলে রক্ত। সংগ্রাম চলছে চলবে। সামনে আমাদের দীর্ঘ রাত। রাত যত গভীরই হোক ভোর একদিন হবেই।'

কেয়া বাত! কেয়া বাত! প্রথমে নিজের ভাষণে নিজেই নাচলুম, তারপর মনে হল একটু বেশি সাহিত্য হয়ে গেল। তখন প্রশ্ন করলুম, 'কে আমাকে শালা বলেছিল!'

তিনজন এগিয়ে এল, 'আমরা বলেছিলুম।'

'এগিয়ে এসো।'

তিন জন এগিয়ে এল।

'কে প্রথম বলেছিলে?'

'আমি হরেন বাউড়ি।'

'বেশ তুমি মূল গায়েন। তুমি হলে আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। বাকি দু'জনের একজন হলে সেক্রেটারি আর একজন ট্রেজারার। ভাই সব সমর্থন করো।'

ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেল। হাতে হাতে বিড়ি ঘুরতে লাগল। আমি এক চিমটি খইনি দিলুম দাঁতে। ধর্মঘট চলছে চলবে। আশার আলো নিবতে দিও না। প্রতিশ্রুতির তেল ঢেলে জ্বালিয়ে রাখো। নাকের সামনে সব সময় যেন একটা গাজর ঝোলে।

বিকেলে পোর্টব্লেয়ার থেকে এক হৃষ্টপুষ্ট নেতা এলেন। রঘুনাথ আইচ। তিনি এসেই আমাকে এক হাত নিলেন, 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন? এত বড় একটা আন্দোলনের ক্রেডিট নিজে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। জানেন না সমস্ত শিল্প আন্দোলনের এজেন্সি পার্টি আমাকে দিয়ে রেখেছে। আপনার মেম্বারশিপ আছে?'

'না।'

'তবে, এখানে মরতে এসেছেন কেন ?'

'ঘটনাই নেতার জন্ম দেয়।'

'মেরে তক্তা করে জলে ভাসিয়ে দিলে কে দেখবে ?'

'আপনি এবার দায়িত্ব নিন। সাতটা দুর্বৃত্তকে তো গারদে ভরা দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট ডেকে দিয়েছি। সব আয়োজন সম্পূর্ণ, খালি একটুকরো লাল শালুরই যা অভাব। একটা নরবলিও হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক দুম করে অভদ্রের মতো বলে বসলেন, 'পোঁদপাকা।'

আমি এই ক্রাইসিসের মধ্যেও প্রতিবাদ না করে পারলুম না, 'গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করছেন ? পেছন বলুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই হল। জানেন, আমাদের সঙ্গে বুলার কোম্পানির এগ্রিমেন্ট আছে, তিন বছর কোনও লেবার ট্রাবল হবে না। কে আপনাকে পাকামো করতে বলেছিল ?'

'তাহলে এখন কি হবে ?'

'লিখুন রেজিগনেশন। আর আমার সঙ্গে চলুন পোর্টব্লেয়ার। গম্ভীরাদের এগেনস্টে কেস উইথড্র করুন। গম্ভীরারা না থাকলে দেশের শিল্প অচল, অর্থনীতি অচল।'

'বুলার কোম্পানি, আপনাকে কত করে দালালি দেয়।'

ভদ্রলোক ঠাস করে এক চড় মারলেন। রঘুনাথ আইচও আমাকে চড় কষাচ্ছে ! কানে তালা লেগে গেল। সেই থেকে আমি কানেও কম শুনি। একটা দাঁত, একটা কান, নিজের গ্যাঁটের হাজারটা টাকা আর জামাকাপড় যা নিয়ে গিয়েছিলুম সব খুইয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম। আত্মীয়স্বজনদের ভিড় লেগে গেল। যাবার সময় সব গোমড়া মুখ ছিল। এখন বেশ হাসি ফুটেছে। আমি ভাঙা টিনের চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছি। ভোরবেলার মাতালের মতো। আমার সেই খুড়োর কি মুখ খুলেছে, 'বুঝলে, আমার নাম শশাঙ্কশেখর। সাত ঘাটের জল আমি খেয়েছি। খেয়ে আমার জ্ঞান হয়েছে। আই নো হোয়াট ইজ হোয়াট। আমি পরে একটা থরো ইনভেস্টিগেশান করেছি, ওই বুলাব কোম্পানি এক সময় ইংরেজদের ছিল। এখন দিশি ডিরেকটাররা লুটেপুটে খাচ্ছে। যে কোনও দিন ক্লোজার হয়ে যাবে। মোটা টাকার লোভে ছুটলে। বাবার হাজারটি টাকা গলিয়ে দিয়ে চলে এলে। বিচার বিবেচনা করে ঝুঁকি নিতে হয়।'

নাতি কোলে সেই প্রবীণা বললেন, 'দেখি দেখি কোন দাঁতটা ভেঙেছে ! কি

আক্কেল গো, ভালো মানুষের ছেলের কাঁচা দাঁতটা খুলে নিলে !

আর একজন বললেন, 'দেখাও না, দেখাও না। লজ্জা কিসের ?'

দশ বারো দিন পরে বুলার কোম্পানির কলকাতার অফিসে গিয়ে অবাক। অমন সুন্দর অফিস পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ। ধর্মঘট। অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলুম। বাটালিওয়ালাকে সব খুলে বলব ; যদি দয়া করে কলকাতার অফিসেই একটা কিছু করে দেয়। তা ছাড়া মায়াবন্দরে আমার এক জোড়া নতুন ট্রাউজার, জামা, পাজামা, চটি, গামছা, মাজন, নারকোল তেল, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, চারটে ইংরেজি উপন্যাস,একটা নতুন চামড়ার ব্যাগ, সব পড়ে আছে। যদি উদ্ধার করা যায় ! গরিব মানুষ আমি।

বেশ বড়সড় একজন নেতাকে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম। মনে মনে একটু গর্বও তো আছে। হোক না আন্দামান, হোক না একটা ছোট কাগজ, তবু তো আমার ছবি ছাপা হয়েছিল, সংবাদ হয়েছিলুম আমি। নেতা আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'আরে কমরেড, আপনি সেই লোক ! লাল সেলাম, লাল সেলাম। ওখানে রঘুনাথদা কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছেন। লাগাতার চলছে। নিন একটা লবঙ্গ খান।'

লবঙ্গ খাবো কেন বুঝতে পারলুম না, তবু মুখে দিলুম।

নেতা বললেন, 'নিন এবার আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিন, ইন কিলাব জিন্দাবাদ। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। এ লড়াই জিততে হবে। ধর্মঘট, চলছে চলবে।'

গানের যেমন ঢিমে আছে, দ্রুত আছে। স্লোগানেরও সেইরকম। ঢিমে, দ্রুত আরও দ্রুত। দুনি, চৌদুনি। খুব এক হাত হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা। এত চেঁচানো ঠিক হল না। গানটান পাই। গলা ড্যামেজ হয়ে যাবে।

'এবার তাহলে আমি যাই। কাল আবার এসে চিৎকার করে যাবো।'

'চিৎকার নয় কমরেড। বলুন স্লোগান। বলুন সংগ্রাম।। নিন এক খুরি চা খান। এখন তো আপনাকে ছাড়বো না। পাঁচটার সময় মিছিল আছে। ফেস্টুন ক্যারি করতে হবে।'

'আমি তো আর কর্মচারী নই।'

'আরে মশাই আপনার জন্যেও তো আমরা লড়ছি। সব ছাঁটাই কর্মচারীকে নিতে হবে।'

'আমি তো ছাঁটাই নই। রঘুনাথ আইচ মশাই রেজিগনেশান দিইয়ে পেছনে লাথি মেরে বিদায় করে দিয়েছেন।'

'সে আমরা ঠিক করে দেবো। কাল একশোটা টাকা এনে আমাদের সংগ্রামী তহবিলে জমা দেবেন।'

সেদিন পাঁচটায় আমাকে দেখা গেল, এসপ্ল্যানেডের মোড়ে। একটা পোস্টার উঁচিয়ে, ভাঙা গলায় চেল্লাতে চেল্লাতে পা টানতে টানতে হাঁটছি। আর ক্ষমতা নেই। ককিয়ে ককিয়ে বলছি, সংগ্রাম চলছে চলবে। সেই যে আমার হাতে ফেস্টুন উঠেছিল, সেই ফেস্টুন আজও নামলো না। বছরে দু'তিনবার পথে নামতেই হয়। চলছে চলবে।

প্রায় অচল হয়েই আসছিল। বাবার শরীর অচল। মাথার সামনের টাক বিশাল হতে হতে প্রায় এক একর নিষ্ফলা প্রান্তর। মায়ের বিশাল চুল যেন এক চিলতে টিকটিকির ন্যাজ। হাঁটুতে বাত। একবার বসে পড়লে উঠে দাঁড়াবার সময় বাবারে, মারে অবস্থা। নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি। যুক্তফ্রন্ট সিংহাসনে। আমার সেই জেলে যাওয়া নেতার বাড়ির কাঁচভাঙা, মায়াবন্দরের বিপ্লবী অতীত, ফেস্টুন হাতে চলছে চলবে, এই সব কোয়ালিফিকেশন ভাঙিয়ে আধা সরকারী একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি জুটল। সে খুব মজার প্রতিষ্ঠান, অনেক লোকজন ; কিন্তু কোনও কাজ নেই। বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করলুম, আমরা কি কাজ করব ? তিনি বললেন, আমাদের কাজ হল কাজের রূপরেখা তৈরি। ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়ার্ক প্ল্যানিং। রোজ অফিসে যাই আর সময় কাটাবার জন্যে সহকর্মীদের মুখ স্কেচ করি। স্কেচ করতে করতে আমার আর একটা প্রতিভা খুলে গেল, ছবি আঁকা। বাড়িতে সত্যনারায়ণ হল। নাতিকোলে প্রবীণা সিন্নি খেতে খেতে বললেন, 'কত মাইনে দেবে ?'

'সব মিলিয়ে টিলিয়ে আটশো।'

'ওমা, এম এ পাশ করে তাহলে হলটা কি ? আমার রাজেন ম্যাট্রিক পাশও নয় দু'হাজার টাকা পায়।'

কাকা বললেন, "ও অমন হয়। ফোগলার পেটে বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর বেরোবে না, ওয়াগন ভেঙে মাসে দশ হাজার কামাই করে।"

পার্বতীর বাবা এই সময় এক কাণ্ড করলেন, কালো মতো এক ভদ্রমহিলাকে বাড়িতে এনে স্ত্রীকে বললেন, 'হ্যাঁ গো, তোমার সতীন নিয়ে এলুম। ক্ষমতা থাকে কোর্টে যাও, নয় তো মানিয়ে নাও। আমার বাপু সাফ কথা, বেশি বয়সে হলেও বংশরক্ষার জন্যে আমার একটি পুত্র সন্তান চাই।'

পারমাণবিক বিজ্ঞানে চেন-রিঅ্যাকসান বলে একটা কথা আছে, এক্ষেত্রেও তাই হল। পার্বতী সোজা বেরিয়ে এসে ঘাড়ে চেপে বসল। আর আমার বাবা

আমার পশ্চাতে হাঁটুর মতো গুঁতো মেরে বললেন,'বাঈজীটিকে নিয়ে বিদেয় হও।' আর আমার মা সদরে গোবরজল ছিটিয়ে বললেন, 'মনে করবো, আমার ছেলে মরে গেছে।'

একটা মাঠকোটা মতো বাড়িতে আটশো টাকার সংসার শুরু হল। পার্বতীর মা এসে ঘাড়ে চেপে বসলেন। দুঃখের সঙ্গে হাসি মুখে লড়াই করা যায়। ভুল বোঝাবুঝির সঙ্গে লড়াই করা যায় না। বাবা আর মা রইলেন গোলাপের কাঁটা। আমি অবশ্য হাল ছাড়িনি।

দুটো বছর পার্বতী নেচে নেচে সংসার করল। ভোরবেলা বিছানা থেকে নেমে নেচে নেচে বাথরুমে যায়। নেচে নেচে তারে কাপড় মেলে। নেচে নেচে চিরুনি চালায় চুলে। নাচ শিখিয়ে কিছু কিছু রোজগার করে সংসারের আয় বাড়ায়। মাস তিনেক মোটা মতো একটা লোকের পাল্লায় পড়ল। সিল্কের পাঞ্জাবি পরতো। সব সময় মুখে পানজর্দা। একটা গাড়ি ছিল। লোকটা পার্বতীকে বিরাট এক শিল্পী করে দেবার স্বপ্ন দেখালে। মা মা করে পার্বতীর মাকে হাত করেছিল। মাঝে মাঝে গাড়ি চাপিয়ে মা আর মেয়েকে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যেত। কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোথাও তার একটা বাগানবাড়ি ছিল। ভুঁড়ি আর মুখচোখ দেখেই বুঝেছিলুম লোকটি জলপথে বিচরণ করে। পার্বতীকে সাবধান করেছিলুম। শিল্পী হবার স্বপ্নে বিভোর। আমার কথা শুনবে কেন? একদিন খুব ঘটা করে তিনজনে বেরোলো। তিন দিন বেপাত্তা। চারদিনের দিন ভোরবেলা বিধ্বস্ত পার্বতী একা ফিরে এল। বুকে মাথা রেখে হাপুস কান্না। বুঝেই গেলাম ব্যাপারটা কি! জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা বাড়ালুম না। মাঝখান থেকে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। শুধু গেল না, দ্বিতীয়বার হবার সম্ভাবনাটা নিয়ে গেল। ওদিকে সেই লোচ্চাটার বাগানবাড়িতে পার্বতীর মায়ের ভর হতে লাগল। তিনি এখন মা মঙ্গলচণ্ডী। শনি, মঙ্গলবার ভর অবস্থায় ওষুধ দেন। অর্শ, হাঁপানি। যার ছেলেপুলে হচ্ছে না, গ্যারান্টি দিয়ে তার ছেলে করে দেন। অঢেল রোজগার। সংসার গেল, ভর এল।

কোথা থেকে আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট এলো। মজা মন্দ নয়। ভূতের টাকা। ভূতেরই বটে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কীর্তি। প্রায়শ্চিত্ত করলেন আর কি। অঢেল টাকার মালিক। দু'নম্বর শাশুড়ি পুষছেন। লোকটার গার্টস আছে। যতদূর মনে হয় ওই পাড়া থেকে তুলে এনেছেন। পয়া মেয়ে। ব্যবসা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গদির রঙের সঙ্গে নিজের রঙ মিলিয়ে যাওয়ায় আরও সুবিধে হয়েছে। চরিত্রটাকে একটু বিগড়োতে না পারলে পয়সা

হয় না।

টাকা টাকাই। সে কালো ব্যাগ থেকেই বেরোক আর লাল ব্যাগ থেকেই বেরোক। পনেরো হাজার দিয়ে আমি দু'কাঠা জমি কিনে ফেললুম। কাজের কাজ হল একটা। আর পঁয়ত্রিশ হাজার ফিক্সড করে দিলুম। পরে একটা বাড়ি যদি করা যায় মন্দ কি! বাঙালীর বাড়ি। সায়েবের গাড়ি।

পার্বতী আর বাইরে নাচে না। এখন নাচে আমার বুকে। চিত্রতারকা হবার বাসনা ঘুচে গেছে। কে কি করেছে সে নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই। এই সমাজে মেয়েরা বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েরা, খুব একটা নিরাপদ নয়। গাছে ফল পাকলে কাকে ঠোকরাবেই। ফলে গর্ত হয়। দেখা যায়, মানুষ এমন ফল, গর্তটা মনে থাকে। মোটা লোকটা আমার একটা উপকার করে গেছে। মোক্ষম একটা 'রেঞ্জ' আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে। প্রয়োজন হলেই পার্বতীকে আমি টাইট দিতে পারি। প্রয়োজন হয়নি। বাচ্চাটা উলটে যাবার পর খুব অসহায় হয়ে পড়েছে। অহঙ্কার টহঙ্কার যা ছিল সব ঘুচে গেছে। অসহায় ঈশ্বরকে পায়। অসহায় মানুষের ভালোবাসাও পায়। একটু করুণা থাকে সে ভালোবাসায়, তা থাক। সেই মোটা লোকটা, সেই লম্পট ডিরেকটারটা, সেই ধুরন্ধর মহিলাসক্ত ইম্প্রেসারিওটা, সেই সেক্স অ্যাডিক্ট, ভোঁতা কলা-সমালোচকটা, যারা বিভিন্ন সময় উইংসের পাশে, গ্রীনরুমে রেস্তোরাঁর কেবিনে আমার বউয়ের কাপড় সরাতে চেয়েছিল, ব্লাউজের বোতাম খুলতে চেয়েছিল, গালে কামড় দিয়েছিল, সকলেই আমার প্রচণ্ড উপকার করেছে। প্রথমত, আমার ছেলেপুলের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। কত উপকার! ছেলে থাকলে আমি এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে, চেয়ার টেবিল ভাঙতো, পাখার ব্লেড দোমড়াতো মোচড়াতো। উপাচার্যের মাথায় চাঁটা মারতো। আর ধনেখালিতে গিয়ে ডিগ্রি ডিপ্লোমা কিনে আনতো। আজকাল নকল টাঁকশালের মতো, অনেক নকল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। পার্বতীর মেয়ে সুন্দরই হতো; আর আমাদের রাতের ঘুম চলে যেতো। আজ স্কুটার থেকে মস্তান নেমে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরছে। কাল চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে খালি কুঠিতে। পাবলিক পার্কের মতো পাবলিক প্রপার্টি। সকলেরই ইজমেন্ট রাইটস আছে। কিম্বা কিছু পারলে না তো মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে গেল। জনসাধারণ আর গণনায়কদের জন্যে ছেলেমেয়ে ফলাতে পারিনি বলে যেমন দুঃখিত, তেমনি আনন্দিত। অনেক নেপো আমার দই মেরেছে। সেই নেপোরা অন্তত একটা সুযোগে বঞ্চিত, আমার ছেলের হাতে বোমা, ঝাণ্ডা, গাঁজার কলকে, ছুরি পাইপগান ধরাতে পারবে না।

ক্রীতদাস করতে পারবে না। সেই নেপোরা আমার মেয়ের বুক চটকাতে পারবে না। পার্বতীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। হোক, সেইটাই তো আমাদের সোস্যাল হিস্ট্রি। জুতো শোঁকালে দাঁতি লাগা সারে। কিন্তু সেই বিশাল সাপের জুতো কোথায়, যা দিয়ে সমাজের দাঁতি লাগা খোলা যায়। রবীন্দ্রনাথ গলায়, সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের মিউজিয়ামে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ মঠে। আমাদের জীবনে ? শেয়াল ডাকছে। অদৃশ, চৌকিদার হেঁকে ফিরছে, হুঁশিয়ার।

শৈলেন সাধুখাঁ অনেক আগে অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজতো, এখন মেঝেতেই ফেলে যত্রতত্র। কারণ এই সিট অফ লারনিং-এর মেঝেতে আ·ঝাড়ু পড়ে না। একটা ফারনিচারও আস্ত নেই। হতশ্রী অবস্থা। মহাপুরুষদের ছাব ঝুল আর ধুলোর তলায় অস্পষ্ট তিরস্কার। জ্ঞানপীঠে আর জ্ঞান নেই। পরীক্ষার খাতা রেলগাড়িতে। ডিগ্রি ডিপ্লোমা ধনেখালিতে। এখানে এক একটা লোক এক একটা দল। ভাঙচুরেব সাক্ষী হওয়া ছাড়া আমাদের কোনও কাজ নেই। সামনের গেটে স্থায়ী মাইক্রোফোন। স্থায়ী চিৎকার। দেওয়ালে রঙ বদলের প্রয়োজন হয় না। রকমারি পোস্টার। পোস্টারের পর পোস্টার তাহার উপর পোস্টার। সিনেমার পোস্টারও আছে। একালের শ্রীদেবী ছোরা হাতে নাচছে। তলায় লেখা ইনসাফ। মিউজিক কল্যাণজী আনন্দজী। অধ্যাপকরা খিড়কির দরজা দিয়ে আসেন। গম্ভীর, শোকাচ্ছন্ন মুখে। যেন ক্রিমেটোরিয়ামে আসছেন, মা সরস্বতীর সমাধিতে ভুর্জপত্র হাতে। পাশেব হাসপাতালের চার নম্বরীদের কোয়ার্টারে বিয়ের মাইকে অভিনেতার ভারী গলা, ই সব ক্যা হো রাহা হই। সঙ্গে সঙ্গে সদবে হৈহৈ। উপাচার্য পুলিশ পাহারায় ঢুকছেন। মাইকে ঘোষণা, বন্ধুগণ আজ আমাদের কর্মসূচী, উপাচার্যের টেংরি খোলার আপ্রাণ চেষ্টা। মাথায় চাঁটা মারা। ক্লিযার একটা ল্যাং মারা। ধুম্‌ধাম্ গোটা ছযেক বোমা ফাটল। বড় রাস্তায় জাল ঢাকা গাড়িতে পুলিশ নড়েচড়ে বসল। ভদ্রমহিলা কাপ লাগানো ব্রেসিয়ার কিনতে কিনতে ঘুরে তাকালেন। পাবলিকেশানস সেলস কাউন্টারে এক প্রবীণ অনবরত প্রশ্ন করে চলেছেন, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়েব বেদান্ত দর্শনটা কি পাওয়া যাবে !

ছ'জন কম্যান্ডো আমাদেব ট্যাবুলেশান ডিপার্টমেন্টে এসে ঢুকলো। সামনেই শৈলেন সাধুখাঁ। তার কাঁচা পাকা চুলে একটা উড়োন চাঁটা মেরে বললে, 'চল শালা, মিটিং-এ চল।' সাধুখাঁর ঢুল এসেছিল। মনে হয় স্বপ্ন দেখছিল। ছেলেবেলায় স্কুলের কি টোলের স্বপ্ন। দু'কানে হাত দিয়ে বললে, 'যত্ন বিধান, ণত্ববিধান জানি স্যার।'

একজন কম্যাণ্ডো আমার দু'কাঁধে পা রেখে চট করে ওপরে উঠে পড়ল। দেওয়ালে ঝুলছিল ঘড়ি। পেন্ডুলামটা মুচড়ে খুলে নিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। আমি সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠলুম, 'নিপাত যাক। নিপাত যাক।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন, উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বর বহুরূপী গিরগিটি। তাঁর রং এক একজনের কাছে এক একরকম। ঈশ্বর কি রকম জানি না, তবে আমি এক গিরগিটি। আমার রং কেউ ধরতে পারে না। আমি একই সঙ্গে রাম রাম, নমস্কার, সালাম আলেকুম, গুড মর্নিং। পার্বতী ভাবে আমি তার, বিপাশা ভাবে আমি তার। কংগ্রেস ভাবে আমি খদ্দর, কমুনিস্ট ভাবে আমি কাস্তে হাতুড়ি। আমি মনে মনে শ্রীমতীর চোখ খুঁজি। নালিকুলের সেই তিলফুল মেয়েটিকে খুঁজি।

আমাব একমাত্র সুখ, একটা নিজস্ব আটচালা, সেখানে অভিমান ভাঙিয়ে বুড়োবুড়িকে এনে ফেলেছি। দু'হাতে সেবা করি। পার্থসারথি নারায়ণ ধরিয়েছিলেন। বেদীর ওপর রেখেছি। বিষ্ণুকুমার দেড়খানা গান দিয়েছিলেন, প্যাঁক প্যাঁকে হারমোনিয়ামে সেইটা গাই। বউয়ের পায়ের ঘুঙুর হাতে উঠেছে। সেইটাই তালে তালে বাজায়। অজ্ঞান হয়ে দাঁতি লেগে গেলে জুতো শোঁকাই। জ্ঞান ফিরে এলে জাপটে ধরে। ভয়! কিসেব ভয়! পৃথিবীটা এই রকমই। এবারটা এই হল। আসছে বার! আমি জানি না। শুধু শোবার আগে বলে শোবো, ঈশ্বর ঘুম ভেঙে যেন আবার আমি অবুঝ মায়ের কোল পাই, বিপর্যস্ত পিতার শাসন পাই, আর যেন একটু ভালোবাসা পাই, সেবার অধিকার পাই। দুটো চোখ পাই। ঠোঁটের ওপর ছোট্ট একটা তিল দেখতে পাই।